দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা ।। ১৪ জুলাই - ২০১৪ ।। ২৯ আষাঢ় - ১৪২১ ।। website : www.eswastika.com ।।

NGO

বিদেশী মদতপুষ্ট এনজিও-গুলির ভারতবিরোধী কাজকর্ম

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯
পশ্চিমবঙ্গে এখন নৈরাজ্যের অন্ধকার,
পুলিশ-প্রশাসন তৃণমুলের দলদাস □ গূঢ়পুরুষ □ ১০
খোলা চিঠি : মোবাইল ফোনের ক্যামেরা নিষিদ্ধ হোক □
সুন্দর মৌলিক □ ১১
দেশের হাল ফিরবে কোন পথে □ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী □ ১২
ইউ পি এ সরকারের আমলেই বাড়বাড়ন্ত
দেশবিরোধী এনজিও-গুলির □ ১৪
কেন্দ্র বেসরকারি সংস্থাগুলির বিদেশী খয়রাতি
বন্ধ করে দিচ্ছে □ তারক সাহা □ ১৬
পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটা আসনেই বিজেপি'র ভোট
বেড়েছে □ ড: নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১৮
রাজ্য বিজেপি-র নির্বাচনী সাফল্য এবং পরবর্তী সঙ্কট □ দেবীপ্রসাদ রায় □ ২০
শ্রীগুরু পূর্ণিমা □ বিদ্রোহী কুমার সরকার □ ২১
গুরু পরম্পরার নানান দিক □ রবীন সেনগুপ্ত □ ২৩
মোদীর সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বার্তাগুলি বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ
কীভাবে নিচ্ছে □ কানোয়াল সিবাল □ ২৭
পরিবেশ সংরক্ষণ : আমাদের সুবিধা কী? □ প্রবীর ঘোষ □ ২৯
মোদী সরকার ও বাজার □ শ্যামল কুমার হাতি □ ৩১
জাতীয়তাবোধ দেশাভিমানের জননী □ অমলেশ মিশ্র □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬ □
অন্যরকম : ৩৩ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮
□ খেলার জগৎ : ৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ২৯ আষাঢ়, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৬, ১৪ জুলাই - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ১৪-১৭

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬
হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে
১৪ই জুলাই
২০১৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বাজেট - ২০১৪

প্রকাশিত হবে
১৪ই জুলাই
২০১৪

সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। এই অধিবেশনেই পেশ হবে রেল ও সাধারণ বাজেট। রেল তো নয়, যেন একটা দেশ। সারা বছরে ৫১১ কোটি লোক যাতায়াত করে। সেই রেল বাজেটের তাই গুরুত্ব অনেক। আর এবারের বাজেট মোদী সরকারের প্রথম বাজেট। এই বাজেট জনমোহিনী হবে, না দেশের আর্থিক ব্যবস্থা মজবুত করতে কিছু কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে— এ সব প্রশ্ন তো রয়েইছে। এবারের বিশেষ বিষয় তাই বাজেট — ২০১৪। লিখেছেন এন সি দে, অম্লানকুসুম ঘোষ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

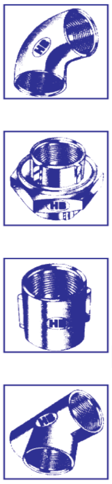

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE &
SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi
Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE ®
PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চাই পরিবর্তনের পরিবর্তন

অত্যাচারী সিপিএমকে হঠাইবার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণকে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা যে ধাপ্পা ছিল তাহা আজ প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁহার পঞ্চায়েতের নেতা হইবারও যোগ্যতা নাই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হইলে রাজ্যের হাল কী হইতে পারে তিন বছরে তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি হইতেছে রাজ্যের মানুষের। যাত্রাপালার ন্যায় সংলাপ বলিতে পারিলে আর নাটকবাজিতে অভ্যস্ত হইলে জোকার হওয়া যায়—নেতা নয়। যেসমস্ত হাড়হিমকরা ঘটনা ঘটাইতে বামফ্রন্টের ৩৪ বছর সময় লাগিয়াছিল সেই সমস্ত ঘটনা মাত্র তিন বছরের মধ্যে আরও বীভৎসরূপে নিত্য রাজ্যে ঘটিয়া চলিতেছে। যে সুখের সন্ধানে মানুষ পরিবর্তন চাহিয়াছিল তাহা আজ বিভীষিকায় পরিবর্তিত হইতেছে। সরকার বদল হইলেও অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। কামদুনি, কাটোয়া, বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, গেদে, পার্ক সার্কাস—নারীর লাঞ্ছনা বন্ধ হয় নাই। খরবোনা, পাড়ুই, সিউড়ী, লাভপুর, বালি, বামুনগাছি—গুপ্ত হত্যা বন্ধ হয় নাই। সারদা, রোজভ্যালি, টেট, এস এস সি, ত্রিফলা প্রভৃতি দুর্নীতির শেষ নাই। সরকার বদল হইয়াছে। পতাকার রঙ পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। খুন, ধর্ষণ, অত্যাচার, দুর্নীতির পরিবর্তন হয় নাই। সবচেয়ে বড় ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ন্যায় বর্তমান পরিবর্তনের সরকারের কাণ্ডারির আচার আচরণ, ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার, ভাষা প্রয়োগ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অমর্যাদা, সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয়, প্রশাসনকে নিলর্জ্জভাবে দলীয় কাজে ব্যবহার, বিরোধীদের হুমকি ও সংশ্রব ত্যাগ, গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিষদৃষ্টি সমানভাবে নয় বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে পরিবর্তনের জন্য মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়া ক্ষমতায় আনিয়াছিল সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। মানুষ প্রতারিত হইয়াছে। বিনয় কোঙার, অনিল বসু, আনিসুর রহমানের বদলে অনুব্রত মণ্ডল, মণিরুল ইসলাম, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তাপস পালদের সৃষ্টি হইয়াছে। সিপিএমের এল সি এমদের বদলে তৃণমূলের দাদা জ্যেঠুদের সমানতালে দাদাগিরি চলিতেছে। যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহা যে আসলে ক্ষমতা পাইবার জন্য নাটক ছিল তাহা আজ প্রমাণিত হইতেছে। গণতান্ত্রিক সমস্ত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতেই তিনি এখন সচেষ্ট। ভোটে রিগিং-এর বিরুদ্ধে তাঁহার পূর্বের নানা বক্তব্যও মানুষ ভুলিয়া যায় নাই। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাইয়াই তিনিও ভোটে জিতিবার জন্য একই পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছেন। বস্তুত বামফ্রন্ট যেইখানে শেষ করিয়াছিল তৃণমূল সেইখান হইতেই শুরু করিয়াছে। কেবল মাত্র সরকার বদল হইয়াছে, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু অন্য কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। যে নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে পাথেয় করিয়া তিনি সরকার গড়িলেন, ক্ষমতায় বসিবার পর নন্দীগ্রামের অভিযুক্ত সেইসব অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের তিনি উপঢৌকন দিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, দুর্নীতি, দলবাজি যদি না বন্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে কিসের পরিবর্তন? রাজ্যে খুনোখুনি, ধর্ষণ, বিরোধীদের প্রতি অত্যাচার যদি সমান তালে চলিতে থাকে তাহা হইলে কিসের পরিবর্তন? প্রশাসন এবং পুলিশ যদি দলীয় নির্দেশেই পূর্বের ন্যায় পরিচালিত হইতে থাকে তাহা হইলে কিসের পরিবর্তন? স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যদি মানুষ একই সমস্যার সম্মুখীন, শিশুমৃত্যু যদি বন্ধ না হইতে পারে তাহা হইলে কিসের পরিবর্তন?

নিন্দুকেরা প্রশ্ন করিতেই পারেন তাহা হইলে কিছুই পরিবর্তন হয় নাই! যে পরিবর্তন সব চেয়ে দ্রুততার সঙ্গে হইয়াছে তাহা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচার আচরণের পরিবর্তন। পূর্বে তিনি যে যে বিষয়ের বিরোধিতা করিয়াছেন বর্তমানে স্বয়ং তাহাই করিতেছেন। পূর্বের সরকারের যে অনৈতিক কাজগুলির তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ক্ষমতায় আসিয়া সেই অনৈতিক কাজগুলিই তিনি নিজেই করিতেছেন। বামফ্রন্টের অনৈতিকতা আজ তৃণমূলে পরিবর্তিত হইয়াছে। তাই চাই পরিবর্তনের পরিবর্তন।

সুভাষিত

একং বিষরসো হন্তি শস্ত্রেনৈকশ্চ বধ্যতে।
স রাষ্ট্রং সপ্রজা হন্তি রাজানং মন্ত্রবিপ্লবঃ।।

অর্থ— বিষপান করলে একজনেরই মৃত্যু ঘটে। (বর্শাদি) অস্ত্রের আঘাতে একজনেরই মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু ভ্রান্ত চিন্তাধারার ফলে রাজা প্রজা সহ সমগ্র জাতিরই বিনাশ ঘটতে পারে।

১৯৪৮ সালেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় পরমাণু শক্তির বিরাট সম্ভাবনার উল্লেখ করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ১৯৫৩ সালে মহাক্ষমতাধর তৎকালীন বিবিসি'কে দেওয়া তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের সম্ভবত একটি মাত্র সাক্ষাৎকারে ড. শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। দিল্লীর মোদী সরকারের প্রচেষ্টায় সেই দুষ্প্রাপ্য বা ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলিত সাক্ষাৎকারটির হুবহু পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত ফাউন্ডেশন এই কাজে নিয়োজিত আছে।

ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শুধু সাক্ষাৎকার নয়, দেশবাসী এই নির্ভীক জাতীয়তাবাদীর যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিকৃত ভাবমূর্তি প্রচারিত, তার সংশোধন করতে ফাউণ্ডেশন শ্যামাপ্রসাদের যাবতীয় লেখালিখি, নানান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা পুস্তকাকারে সংগৃহীত করার প্রচেষ্টায় রত। প্রসঙ্গত এই বিষয়গুলি জনসমক্ষে আনতে পারলে দেশবাসী বুঝতে পারবেন ড. শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন এক উচ্চস্তরের প্রগতিশীল চিন্তাবিদ যাঁর চিন্তাধারার ব্যাপ্তি ছিল নারী অধিকার থেকে বিশ্ব শান্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির প্রয়োগ পর্যন্ত এক বিশাল ক্যানভাসে আধারিত। উল্লেখিত সাক্ষাৎকারটি বিবিসি'র তরফে "Indias Challange: will the democratic experiment succeed?" নামের একটি তথ্যচিত্রের মূল্যবান অংশ বিশেষ হিসেবে গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কাছে শ্যামাপ্রসাদ সেই স্বাধীনতার উষালগ্নে এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হওয়াতেই এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বীরপুঙ্গব রাজনীতিকদের সাফল্যে শ্যামাপ্রসাদ এটি দেখে যেতে পারেননি। তাঁর রহস্যাবৃত অকালমৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই ২৩ জুন ১৯৫৩ সালে বিবিসি এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রচার করে। আশ্চর্যের বিষয়, সম্প্রচারের সময় বিবিসি'র কাছে পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ অজ্ঞাত ছিল।

তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমন্ত্রীর পদ তিনি হেলায় ত্যাগ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু'র সঙ্গে বৈষম্যমূলক ধারা ৩৭০ নিয়ে বিরোধের কারণে। স্বাধীন ভারতে এমন এক দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমিক তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাননি একথা আজ অনেকেই স্বীকার করেন। এই উপেক্ষার মূল কারণ দুটি---প্রথমত নেহেরু গান্ধী পরিবারটিকে প্রাপ্যের অধিক গুরুত্ব দিয়ে অসামান্য প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা ও বামপন্থী অধ্যুষিত সরকারি মাধ্যমগুলির যা কিছু জাতীয়তাবাদী অর্থে ডানপন্থী হিসাবে তার প্রতি তীব্র ঘৃণা। ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ---বর্তমানে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় এই অবিচারের সুরাহা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর অর্জিত মর্যাদায় জাতীয় নেতার তালিকায় স্থান করে নেবেন। শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশন সূত্রে আরও জানা যায়—উল্লেখিত সাক্ষাৎকারটিতে শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় গণতন্ত্রের দুর্বলতা নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করে বলেছিলেন—দেশে মাত্র একটিই বড় রাজনৈতিক দল থাকায় প্রতিবাদ গড়ে ওঠে না। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত পালটাচ্ছে। এমনটা বেশি দিন থাকবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি রাষ্ট্রনেতার মতো বলেছিলেন, তাই বলে বিরোধী দলগুলির শুধু বিরোধিতার কারণেই সরকারের কাজকর্মে অকারণ বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

সংস্থার নির্দেশক ড: অনির্বাণ গাঙ্গুলি জানিয়েছেন---দীর্ঘকাল ধরে শ্যামাপ্রসাদ একজন সাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছেন। দুঃখের বিষয়, কতিপয় মানুষই নিজের চেষ্টায় জানতে পেরেছিল—তিনি ছিলেন একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও তাঁর সময়ের অগ্রণী শিক্ষাবিদ। এই অবহেলিত বিষয়গুলি দেশবাসীর কাছে যথার্থভাবে তুলে ধরতেই তাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলীর পাশাপাশি বিবিসি'কে দেওয়া একমাত্র সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ্যে আনা একান্ত জরুরি। ফাউণ্ডেশন ইতিমধ্যেই বিবিসি'র কাছে টেপের পুঙ্খানুপুঙ্খ তলব করেছে।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে ১৯৪৮ সালে সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তাঁর ভাষণে ড: মুখার্জি বলেছিলেন, "বছর তিনেক আগে জাপানে দু'টি পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় যে ব্যাপক জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয় তার পরিণতিতেই বিশ্বব্যাপী পরমাণু শক্তির নেতিবাচক দিকটিই বহু আলোচিত হয়েছে। অথচ শান্তির সময়ে এর ইতিবাচক ও যথাযোগ্য প্রয়োগ হলে বিশ্বে মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসই বদলে যাবে।" উদাহরণস্বরূপ তিনি ১৭৯৮ সালে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার পরবর্তী বিশ্বের পরিবর্তনের প্রসঙ্গ এনেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ আজ থেকে ৬৬ বছর আগে পারমাণবিক শক্তির সফল ও সুষ্ঠু প্রয়োগে পৃথিবীর বুকে স্বর্গসুখের উপস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। যেখানে তথাকথিত মার্ক্সীয় পুঁজিবাদী ও শ্রমিকের ভেদাভেদ থাকবে না। সমাজে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কেও ছেদ পড়বে। দেশের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এগুলি যুগান্তকারী সম্ভাবনাময়। এর বিস্তৃত বিষয়বস্তু ও বিশদ আলোচনা করতে শ্যামাপ্রসাদের সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতা এবং লেখালেখির সঙ্কলন প্রকাশের গুরুত্ব অপরিসীম।

সৌজন্যে : টাইমস

সংবাদ প্রতিবেদন

জাতীয় জনসংখ্যাপঞ্জী তৈরির কাজে তিন বছরের সময়সীমা বেঁধে দিল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবৈধ অভিবাসীদের দেশ থেকে বিতাড়ন করতে পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁর দপ্তরের আধিকারিকদের জন্য সর্বোচ্চ তিন বছরের সময়সীমা বেঁধে দিলেন জাতীয় জনসংখ্যাপঞ্জী (ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রার) প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের চিহ্নিত করতে। সরকারের তরফে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই প্রকল্পের কর্মী-আধিকারিকেরা গোটা দেশেই দরজায় দরজায় ঘুরে প্রকৃত তথ্য যাচাই করতে এবং তার ভিত্তিতে স্রেফ ভারতীয় নাগরিকদের জন্যই ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার কার্ডের ব্যবস্থা করতে। সরকারের এও পরিকল্পনা রয়েছে যে এই কার্ডটিকে ভোটাধিকারের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। এর ফলে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা হিসেবে কেবল সচিত্র নির্বাচনী পরিচয়পত্র-ই একমাত্র প্রমাণাদি হিসেবে বিবেচিত হবে না। রাজনাথ গত ১৯ জুন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এবং সেই বৈঠকেই তাঁর এই পরিকল্পনার কথা জানান। ২০১১-র জনগণনার যাবতীয় তথ্য-পরিসংখ্যান ডিজিটালাইজ করে জমা করার কাজের দায়িত্ব যে কর্মী আধিকারিকদের হাতে বর্তে ছিল, তাদেরই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ১৯৫৫-র নাগরিক আইন (সিটিজেন্স অ্যাক্ট) অনুযায়ী দেশবাসীর নাগরিকত্ব প্রমাণের ব্যবস্থা করতে। ওই আইন বলছে কোনও ব্যক্তির নাগরিকত্ব তখনই প্রমাণিত হবে যখন তিনি আইনের চাহিদা মোতাবেক তথ্য-প্রমাণাদির মধ্যে অন্তত ছ'টি দাখিল করতে সক্ষম হবেন।

সূত্রের খবর, পুরো প্রক্রিয়াটাই প্রচুর খাটুনির এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি তহসিল (সাবডিভিশন) কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। প্রতিটি জেলার রেভিনিউ আধিকারিক বিষয়টির দেখভাল করবেন। প্রসঙ্গত, ২০১০-এ দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে জাতীয় জনসংখ্যাপঞ্জী প্রকল্পটির পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু তখন শুধুমাত্র বাসস্থানের পরিসংখ্যান নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। যার ফলে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি-র পরিকল্পিত আধার কার্ডের সঙ্গে এর পার্থক্য করাই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে বায়োমেট্রিক পরিচিতির মতো কিছু বৈশিষ্ট্য এই দুই ধরনের প্রকল্পেই থাকায় একটিতে থাকলে আরেকটির কী প্রয়োজন সেই প্রশ্ন উঠছিল।

বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাই প্রথমেই ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রারের বৈশিষ্ট্যকে একেবারে নির্দিষ্ট করে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরলো বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন। একইসঙ্গে তথ্য যাচাইয়ের জন্য এর কর্মী আধিকারিকদের আরও বেশি ক্ষমতা দিল নরেন্দ্র মোদীর সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক বরিষ্ঠ আধিকারিক জানিয়েছেন : 'বর্তমান সরকারের কাজকর্ম এই প্রকল্পের ব্যাপারে অত্যন্ত পরিষ্কার। আমাদের বলা হয়েছে ভারতীয় নাগরিকদের থেকে অবৈধ অভিবাসীদের আলাদা করতে। আর এই কাজ আগামী তিন বছরের মধ্যে শেষ করতে বলা হয়েছে। এই অবৈধ অভিবাসীদের ভারত ছাড়তেই হবে ওই চূড়ান্ত সময়সীমার মধ্যে। ২০১১-র জনগণনার সময় আমাদের কর্মীরা যাঁদের যাঁদের বাড়ি গিয়েছিলেন, তাঁদের বাড়ি আবার যাওয়া হবে। বাসিন্দাদের প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে তাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বলা হবে।'

সূত্রের খবর, বেশ কিছু রাজ্যে যেখানে বায়োমেট্রিক তথ্য গৃহীত হয়েছে, সেখানে এই মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না কেন্দ্র। বরং বিগত সরকারের অকর্মণ্যতাকে ঢাকতে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি কর্তৃক গৃহীত বায়োমেট্রিক তথ্য-পরিসংখ্যানের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে তবেই মাঠে নামতে চাইছে রাজনাথের মন্ত্রক। এই তথ্য-যাচাই প্রক্রিয়ার জন্য কী পরিমাণ অর্থ ও লোকবল প্রয়োজন তা জানতে গত ১ জুলাই একটি বৈঠকও ডাকে সরকার। সূত্র বলছে, বিগত সরকারের আমলে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার প্রকল্পের জন্য বাজেট ছিল ৬ হাজার ৬৪৯ কোটি টাকা। যার মধ্যে প্রায় চার হাজার টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। এখন দরজায় দরজায় ঘুরে তথ্য যাচাইয়ের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে বাকি টাকায় সেই খরচা কুলোবে বলে মনে করছেন না আধিকারিকেরা। কারণ আগামী তিন বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে কী পরিমাণ লোকবল লাগবে তা ভাবতেই গলদঘর্ম দপ্তরের আধিকারিকদের। তবে বিজেপি সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিগত ইউপিএ সরকারের মতো টাকা নেই-এর অজুহাতে কোনও প্রকল্পকেই আর ঝুলিয়ে রাখা হবে না। তাই অতি দ্রুত এর প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করে কাজে নামতে চাইছে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রার কর্তৃপক্ষ।

জনসংখ্যা পরিসংখ্যান : কিছু তথ্য

* ১১৮ কোটি ভারতীয়র জনসংখ্যাগত নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জনগণনা আধিকারিকদের কাছে রয়েছে।
* এর বাইরে, এন পি আর-এ ২৫ কোটি মানুষের বায়োমেট্রিক পরিসংখ্যান নথিভুক্ত রয়েছে। বাকি মানুষের তা নেওয়া হয়েছে ইউ আই ডি এ আই-এর মাধ্যমে।
* বিগত সরকার এর জন্য বাজেট ধার্য করেছিল ৬,৬৪৯ কোটি টাকা যার মধ্যে ইতিমধ্যেই খরচ হয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকা।

কপালে ভাঁজ কংগ্রেস ও বামেদের

কেরলে মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ দুই হিন্দু সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কেরলকে নিয়ে একটা রসিকতা চালু হয়েছে সাম্প্রতিকতম লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর। বলা হচ্ছে, ভাগ্যিস কেরল রাজ্যটা ছিল তাই ২০০৪-এর দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুই রাজনৈতিক সত্তা— কংগ্রেস ও বাম, এই ২০১৪-য় অন্তত অবলুপ্ত প্রজাতিতে পরিণত হয়নি। সত্যিই কেরলের ২০টি আসনের মধ্যে ১২টি কংগ্রেস ও ৮টি বামেরা দখল করেছে। দেশজুড়ে যে মোদী সাইক্লোন বয়ে গিয়েছিল তার থেকে কেরল যেন অন্তত নির্বাচনী ফলাফলের নিরিখে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থান করছিল। কিন্তু এবার অবস্থান পাল্টাতে শুরু করেছে কংগ্রেস আর বামেদের সেই পরম আশ্বাসস্থল কেরলও। কেরলের দুটি হিন্দু সংগঠন নায়ার সার্ভিস সোসাইটি (এন এস এস) এবং শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম (এম এন ডি পি) মোদী ও বিজেপি-কে দিল্লীতে সরকার গঠনের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে। এন এস এস এবং এস এন ডি পি তাদের মুখপত্র যথাক্রমে 'সার্ভিস' ও 'যোগ নাদম'-এর প্রচ্ছদেই মোদীর ছবি ছাপিয়েছে বড়ো করে। প্রসঙ্গত, হিন্দু উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে এন এস এস এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে এস এন ডি পি। এদের মুখপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও মোদীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'সার্ভিস'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছে— দেশের মানুষের বিরাট প্রত্যাশা ছিল যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে পরিবর্তন আসবে এবং একটি সুদৃঢ় সরকার দেশ শাসন করবে। দেশবাসীর এই আশা পূর্ণ হয়েছে। যেহেতু বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন এন ডি এ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। এন এস এস এবং এস এন ডি পি-র মুখপত্রে মোদীর এহেন গুণগানে বলাই বাহুল্য বেশ চাপের মুখে পড়ে গেছে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। কারণ এই দুই হিন্দু সংগঠনের হাতে রাজ্যের মোট ৪১ শতাংশ ভোট রয়েছে। 'যোগ নাদম'-এর সম্পাদকীয়তে বিষয়টিকে 'মোদীর প্রথম গোল' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং এই সম্পাদকীয়টি স্বহস্তে লিখেছেন স্বয়ং এস এন ডি পি প্রধান।

অন্যদিকে 'সার্ভিস'-এ এমনও বলা হয়েছে যে মোদীর নেতৃত্বে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র জয় আসলে দেশবাসী-রই জয়।

আবার এস এন ডি পি-র মুখপত্রে বলা হয়েছে মোদীকে অত্যন্ত নিকৃষ্টমানের নির্বাচনী প্রচারের মোকাবিলা করতে হয়েছে। এই বছরের গোড়া থেকেই অবশ্য দেখা যাচ্ছিল যে এস এন ডি পি-কে বিজেপি-র কাছাকাছি আসতে। গত ফেব্রুয়ারিতে কোচিতে যে দলিত সম্মেলন হয়েছিল তাতে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন এস এন ডি পি প্রধান নাতেসান আর সেই সম্মেলনের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ছিলেন নরেন্দ্র মোদী।

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন এন এস এস এবং এস এন ডি পি এই মুহূর্তে মোদীকে নিয়ে যেভাবে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য দেখাচ্ছে তাতে তার অচিরেই পুরোনো অভ্যেস— নির্বাচনে হয় কংগ্রেস কিংবা বামেদের সমর্থন, তা ঝেড়ে ফেলবে। আর এতেই কপালে গভীর উদ্বেগের ভাঁজ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ এবং বামেদের জোট এল ডি এফের। ■

ধনেখালির গ্রামে কবর দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা

সংবাদদাতা।। হুগলী জেলার ধনেখালি থানার দশঘরা অঞ্চলের বেলেপোতা গ্রামে একটি খাস জমিকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এই খাসজমিটি দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুরা ব্যবহার করে আসছে। এখানে হিন্দুরা পূজাদি করে থাকেন। এর লাগোয়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি কবরস্থান আছে। বামফ্রন্টের আমলে হিন্দুদের বাধা সত্ত্বেও মুসলমানরা একবার কবর দেয়। তখন থেকেই মুসলমানরা হিন্দুদের ব্যবহৃত খাস জায়গাটা নিজেদের দখলে আনার জন্য দাবি করতে থাকে। তখন হিন্দুরা প্রতিবাদ জানায়। তৎকালীন জেলা শাসকের উপস্থিতিতে মীমাংসা হয় যে, জমিটা হিন্দুরাই ব্যবহার করবে।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। গত ৩০ জুন একটি মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্য আনা হয়। হিন্দুরা এর প্রতিবাদ জানালে মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে কবর দেওয়ার দাবি জানাতে থাকে। তারা মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে ১৭নং রুটের বাস স্টপেজের কাছে মদের দোকানের সামনে কয়েক ঘণ্টা পথ অবরোধ করে। লাঠি ছোরা বল্লম নিয়ে দাপাদাপি করে। উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে পথ অবরোধ উঠলেও এখনও উত্তেজনা রয়েছে। উল্লেখ্য, ওই এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি না হলেও বাইরে থেকে কেউ কেউ তাদের প্ররোচিত করছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ।

বাংলাদেশে বাজেট বরাদ্দেও সংখ্যালঘুরা বৈষম্যের শিকার

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে নতুন অর্থবছরের (২০১৪-১৫) বাজেট পাশ হয়ে গেল ৩০ জুন। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শেখ হাসিনার আওয়ামি লীগ সরকার ধর্মমন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যে কত বরাদ্দ দিলেন এই বাজেটে? পরিসংখ্যান বলছে, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে মাথাপিছু বরাদ্দ ১১ টাকা, আর সংখ্যালঘু নাগরিকদের জন্যে মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৩ টাকা। হজের জন্যে বরাদ্দ আছে ৪৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। হিন্দু বৌদ্ধ ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রার জন্যে কোনো বরাদ্দ নেই। এই বাজেট বিরোধী দল জাতীয় পার্টি, যে দল ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে সংবিধান সংশোধন করেছিল, পুরোপুরি সমর্থন করেছে। সংবিধানের অঙ্গীকার, ধর্মনির্বিশেষে সব নাগরিককে সমানভাবে দেখতে রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু এই চিত্র কি বলছে?

বাজেটে ধর্মমন্ত্রণালয়ের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৬৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যে বরাদ্দ ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, খৃস্টান সম্প্রদায়ের জন্যে ১৫ লক্ষ টাকা। সর্বমোট ৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে বাংলাদেশের প্রায় দু'কোটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকের জন্যে, যা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটের মাত্র ২.৮ শতাংশ। বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট বাজেটের ৫.৫ শতাংশ, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১.৭ শতাংশ, ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩.৫ শতাংশ, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬.৯ শতাংশ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৭.৪ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে বরাদ্দ ছিল। হজের জন্যে বরাদ্দের চিত্রটি এরূপ : বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪৩ কোটি ৫৭ লক্ষ, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৭ কোটি ১৩ লক্ষ, ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ, ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৯ কোটি ৭১ লক্ষ।

ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাবদ বরাদ্দ ৩৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭৩ লক্ষ

৪৮ হাজার টাকা, ২০১১-১২ অর্থবছরে ২২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৯ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৮ লক্ষ টাকা। এ অর্থের সবটাই ইসলামভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত চাঁদা। হিন্দু বৌদ্ধ কিংবা খৃস্টান সম্প্রদায়ের কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাবদ কোনো বাজেট বরাদ্দ অতীতে ছিল না, এবারেও নেই।

আগে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রকাশ্যে নও মুসলিমদের (ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী) পুনর্বাসনের জন্যে বরাদ্দ রাখা হোত। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ অভিযোগ করেছে, এখন বিভিন্ন উপখাতে প্রচ্ছন্নভাবে এ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। লক্ষণীয়, এই বরাদ্দ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রদত্ত অর্থের চেয়েও অনেক সময় বেশি ছিল। যেমন ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৬ কোটি ৬২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। এর মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আমানত তহবিল হিসেবে রাখা হয়েছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। অথচ নও মুসলিমদের জন্য রাখা হয়েছিল ১০ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামি কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্যে ইসলামি ফাউন্ডেশন গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে প্রত্যেক জেলায় এই ফাউন্ডেশনের তৎপরতা সম্প্রসারিত হয়। অন্য ধর্মের উন্নয়নে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। সংখ্যালঘুদের দাবির মুখে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জমানায় তিন সম্প্রদায়ের জন্যে পৃথক ট্রাস্ট গঠন করা হয়, কিন্তু সংখ্যালঘুরা এই ট্রাস্ট প্রত্যাখ্যান করে। তাদের যুক্তি, ট্রাস্ট ফাউন্ডেশনের সমমর্যাদার নয়। অর্থাৎ পাকিস্তানি আমলে সংখ্যালঘুদের 'পবিত্র আমানত' বর্ণনা করা হোত, সেই ধারণা থেকে ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্টগুলোর জন্যে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে আমানত হিসেবে রাখা হয়েছে, এই আমানতের সুদে তিন ধর্মের মঠ-মন্দির-গির্জার কিছু উন্নয়ন কাজ পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ কয়েকদিন আগে সংবাদ সম্মেলন করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা চলবে পৌনঃপুনিক আসলে। এই মানসিকতা পাকিস্তানি মানসিকতারই পুনরাবৃত্তি। নেতৃবৃন্দের প্রশ্ন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতি বছর ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মতো একই হারে সব ধরনের কর, শুল্ক ও নাগরিক হিসেবে প্রদেয় সকল অর্থ পরিশোধ করেন। তারপরও এই বৈষম্য কেন?

পশ্চিমবঙ্গে এখন নৈরাজ্যের অন্ধকার পুলিশ-প্রশাসন তৃণমূলের দলদাস

সোজা কথা খোলাখুলি বলাই ভাল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে অরাজকতা ডেকে এনেছে। শাসক দলের নেত্রীর সস্নেহ প্রশ্রয়ে সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তরা রাজনীতির নামে মস্তানি করছে। খুন, তোলাবাজি, ধর্ষণের প্রতিযোগিতা চলছে। কারণ একটাই। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের শাস্তি দেওয়ার শক্তি রাজ্য পুলিশ এবং রাজ্য প্রশাসনের নেই। বিগত ৩৫ বছর বাম-জমানায় পুলিশ ও প্রশাসনকে পঙ্গু করে দেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। পার্টির হুকুমে পুলিশ প্রশাসনকে চলতে হয়েছে। মহাকরণ নয়, আলিমুদ্দিনের পার্টি অফিস থেকে রাজ্য প্রশাসন চালিত হয়েছিল। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে মুখ্য সচিবের। বাম জমানায় প্রমোদ দাসগুপ্ত-অনিল বিশ্বাসের নির্দেশ মেনে তখনকার মুখ্য সচিবদের চলতে হয়েছে। তৃণমূলের বর্তমান জমানায় মুকুল রায়-মদন মিত্তিররা প্রশাসনে শেষ কথা বলেন। মুখ্যসচিব প্রশাসনে সর্বেসর্বা নন। রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশের সর্বস্তরের কর্তারা নিতান্তই গোবেচারা সরকারি কর্মীদের মতো নেতাদের হুকুম তামিল করেন। ভাবলে কষ্ট হয় যে, মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্ররা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে আই এ এস, আই পি এস হয়েছেন। রাজ্যের মানুষ তাঁদের কাছে নিরপেক্ষ স্বচ্ছ প্রশাসন পরিচালনার দৃঢ়তা আশা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে দলতন্ত্রের কাছে মাথা নত করেছেন। এবং করেই চলেছেন। বৃটিশ রাজত্বে অনেক আই সি এস অফিসার নিরপেক্ষতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য দেশবাসীর কাছে সম্মানের পাত্র হয়েছেন।

গত ৬ জুলাই রবিবার কলকাতায় সমস্ত সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় খবর ছাপা হয়েছে যে, বনগাঁর কাছে দত্তপুকুরে ২২ বছরের তাজা যুবক সৌরভ চৌধুরীকে তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে খুন করেছে। সৌরভের অপরাধ, সে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। বলা বাহুল্য, অপরাধীদের একজনকেও পুলিশ ধরেনি। উল্টে এই নির্মম বর্বর হত্যার বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানালে প্রতিবাদীদের উপর পুলিশ বেপরোয়াভাবে লাঠি চালায়। স্থানীয় গুণ্ডা এবং এই খুনের মূল অভিযুক্ত শ্যামল কর্মকার এলাকার ছোট জাগুলিয়া পঞ্চায়েতের প্রভাবশালী তৃণমূল সদস্য তুষার মজুমদারের ঘনিষ্ঠ অনুগামী। এখন

গূঢ়পুরুষের কলম

তিনি দাবি করছেন, 'আমি শ্যামলকে চিনিই না।' আজ থেকে দু'বছর আগে বনগাঁর কাছেই গোবরডাঙ্গা স্টেশনে সুটিয়া গণধর্ষণের প্রধান প্রতিবাদী কলকাতার মিত্র ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। আজও অপরাধীরা সাজা পায়নি। পুলিশের তদন্তের প্রহসন চলছে, চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর শুধুমাত্র উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় দুষ্কৃতীদের হাতে খুন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ছয়টি। যেমন, বারাসতে ২০১১ সালে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে নিজের দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে খুন হন কিশোর ছাত্র রাজীব দাস। এই জেলার কদম্বগাছিতে ২০১৩ সালে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জনৈক চিকিৎসককে খুন করে। গোবরডাঙ্গা রেল স্টেশনে ২০১২ সালে বরুণ বিশ্বাসের খুনের উল্লেখ করেছি। এই তিনটি খুনের ঘটনার তদন্ত ও বিচার চলছেই। কেউ সাজা পায়নি। কোনোদিন যে শাস্তি পাবে সেই আশাটা এখন দুরাশায় পরিণত হয়েছে। যেমন, এই জেলারই কামদুনিতে ২০১৩ সালে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্ত এবং বিচার চলছেই। গত বছরেই মধ্যমগ্রাম এবং গাইঘাটাতে দুটি পৃথক ঘটনায় দুই কিশোরীকে গণধর্ষণ করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এই দুটি ক্ষেত্রেও তদন্ত ও বিচার চলছেই। পুলিশ ও প্রশাসন শাসক দলের নির্দেশে চলার জন্যই আজ পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্যের অন্ধকার ঘনিয়েছে। তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকলে সাত খুন মাফ। শাসক দলের তাপস পাল, অনুব্রত মণ্ডল বা মণিরুলরা খুন, ধর্ষণ চালাবার উস্কানি দিলেও দিদি তাঁর অনুগত কর্মীদের ক্ষমা করে দেন। বলে দেন, 'ও সব মিডিয়ার অপপ্রচার। বানানো গল্প।'

একটা কথা আমার মগজে ঢোকে না যে, এতসব দুষ্কর্মের পরেও রাজ্যের মানুষ কীসের আশায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের লোকসভার নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৪টিতে তারা তৃণমূলকে জিতিয়েছেন। তৃণমূল সাংসদ তাপস পালের বিতর্কিত মন্তব্য, 'দলের ছেলেদের ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে রেপ করিয়ে দেব।' অথবা 'আমি চন্দননগরের মাল' ইত্যাদি ইতরামি নিয়ে ধিক্কার জানানো হচ্ছে। অথচ কৃষ্ণনগর লোকসভা আসনের ভোটদাতারাই এমন একজন প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জিতিয়েছেন। কেন? আমরা কি আজ ভাল-মন্দের বিচারশক্তি হারিয়েছি! এখন যেমন আমরা অনুব্রত, মণিরুল, তাপস পালদের পা চাটছি, আর দিদির জয়গান গাইছি, ঠিক এমনিভাবেই আমরা বাম-জমানায় অনিল বসু, বিমান বসু বা আনিসুর রহমানদের অশ্লীল কথাবার্তাকে হাততালি দিয়ে সমর্থন করেছি। তাপস পালদের মতোই সি পি এমের এইসব নেতারা ক্ষমা চাওয়া মাত্রই তাদের বেকসুর খালাস করেছে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। সি পি এমের দেখানো পথেই তৃণমূল দলটি চালিত হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু দলতন্ত্রের পথটি আজও মসৃণভাবে চলছে। রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসন আগে সি পি এমের দলদাস ছিল। এখন তৃণমূলের দলদাস হয়েছে। এমন পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে রাজ্যের মানুষ চাননি। অন্ধকার এই নৈরাজ্যের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে হলে রাজ্যের ভোটদাতাদেরই ঘুরে দাঁড়াতে হবে। তাঁদের জানাতে হবে নৈরাজ্য আর দলতন্ত্র তাঁরা চলতে দেবেন না। আর মাত্র দু'বছর পর রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। ঘুরে দাঁড়ান। ভোটযন্ত্রের বোতাম টিপে আপনারা প্রতিবাদ জানান।

মোবাইল ফোনের ক্যামেরা নিষিদ্ধ হোক

তাপস পাল
সাংসদ, তৃণমূল কংগ্রেস

আপনাকে যে যাই বলুক, আমি কিন্তু মনে করি একেই বলে দাদার কীর্তি। ভাইদের জন্য যিনি এমন ভাবেন তিনিই তো যোগ্য দাদা। তিনি নিজে সাংসদ হয়েছেন। আগে বিধায়কও হয়েছেন। উড়ে গিয়ে জুড়ে বসেছেন কৃষ্ণনগরে। কিন্তু যেই ভাইয়েরা দিনরাত পরিশ্রম করে দাদাকে জেতায় তারা কী পেয়েছে! কিছুই পায়নি। কিন্তু দাদা অকৃতজ্ঞ নন। তিনি ভাইয়েদের জন্য 'রেপ-আনন্দ' ভোগের সুবিধা করে দিতে চেয়েছেন। এর বেশি আর কি? এত ছিঃ ছিঃ করার কী আছে? একটু মুখ ফস্কে মনের কথা বলে ফেলেছেন বলে এত নিন্দার কী আছে? কত লোক তো মনে মনেই....

যাকগে, দাদা আপনি ভাববেন না। এমন তো হয়েই থাকে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, আপনার এই বক্তব্যের সঙ্গে মিশে থাকা দুই নগর আপনার সঙ্গে নেই। আপনার জন্মশহর চন্দননগর আর লোকসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগর একটি সম্পর্কে দুই ভাই। দুই শহরই নারীশক্তি জগদ্ধাত্রী পূজার নগর। তাই তো ফেসবুক টেসবুকে চন্দননগর আপনাকে কু-সন্তান আর কৃষ্ণনগর আপনাকে কু-সাংসদ বলে গাল পাড়ছে। কিন্তু এসবে গুরুত্ব দেবেন না দাদা। আছে দিদি মারে কে?

এর আগে বীরভূমের মাননীয় অনুব্রত সন্ত্রাসের হুমকি দিয়েছিলেন যখন, তখন দিদি ভাইকে আড়াল করতে দারুণ যুক্তি সাজিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ও (অনুব্রত) অসুস্থ ছেলে। ওর মাথায় অক্সিজেন কম ঢোকে। তাই ও বলতে চায় এক কথা আর মুখ দিয়ে বের হয় অন্য কথা। কিন্তু এবার আর অক্সিজেন থিওরি দেননি। আমি ভেবেছিলাম উনি যুক্তিযুক্ত কিডনি থিওরি দেবেন। বলবেন, সেই সাহেব সিনেমায় ছেলেটা সংসারের জন্য কিডনি দান করেছিল। তারপর থেকেই একটা কিডনি নিয়ে চলছে। তাই ওরকম কথা বেরিয়ে গেছে মুখ ফস্কে। একটা কিডনি সব কথা ছেঁকে নিতে পারে না।

যাই হোক, সেই যুক্তি না দিলেও আপনার মন্তব্যে আপনার দাদা-দিদিরা নতুন প্রশ্ন তুলেছেন। উঠে এসেছে অতীতের এমনই নানা অশালীন মন্তব্যের উদাহরণ। প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে কি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস দেখিয়েছিল সি পি এম? আপনি তো দলের চাপে একটা গোটা চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়েছেন। তাতে রাজ্যের প্রধান শাসক দল ক্ষমা করে দিয়েছে। ওটাই যথেষ্ট। তৃণমূল কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যে ক্ষমা করার অধিকারও অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেসের। ২০১১ সালের ২৩ এপ্রিল দলীয় জনসভায় আরামবাগের প্রাক্তন সি পি এম সাংসদ অনিল বসু সত্যিই ন্যক্কারজনক কথা বলেছিলেন আপনার দিদি তথা আমাদের সকলের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে। ২০১২ সালের ৩০ এপ্রিল পার্টি থেকে বহিষ্কার করে সি পি এম। কিন্তু সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যের জন্য নয়। দলবিরোধী কাজের জন্য। তবে সি পি এম প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলেছিল আর এক অশালীন মন্তব্যের নায়ক আনিসুর রহমানকে। ২০১২ সালের ২৬ ডিসেম্বর অশালীন মন্তব্য করেছিলেন আনিসুর। গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারেও সিঁদুর প্রসঙ্গে অশালীন ছিলেন আনিসুর। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝাতে তৃণমূল নেত্রীর আঁচল প্রসঙ্গ টেনে এনে এখনও পর্যন্ত কোনোরকম ক্ষমা চাননি বিমান বসু। দলও এমন অশালীনতার নিন্দাটুকু করেনি। যেমনভাবে নন্দীগ্রামে নৃশংস হত্যার পর 'দে হ্যাব বিন পেইড ব্যাক বাই দেয়ার ওন কয়েনস' বলেও আজও ক্ষমা চাওয়ার নৈতিকতা দেখাননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

দাদা, আপনার দলের এমন সব যুক্তির পরও উঠেছে প্রশ্ন। তাদের বক্তব্য, সি পি এম করলেই তৃণমূল কংগ্রেসকে করতে হবে— এমন কোনও অর্থ নেই। আর বাকি মন্তব্য ছিল অশালীন, তবে আপনার মন্তব্য ফৌজদারির অপরাধ। কাউকে (ধর্ষণের মতো নিন্দনীয়) অসামাজিক কাজ করার নির্দেশ দেওয়া, খুনের প্ররোচনা দেওয়া আইনের চোখে মারাত্মক অপরাধ। তবে আপনি ভাববেন না। আপনার চুলও কেউ ছুঁতে পারবে না। আইনের হাত অত লম্বা নয় যে দিদিকে টপকে আপনাকে ছুঁবে প্রশাসন। আমি বলছি বটে, তবে আমারও মনে সন্দেহ আছে যে আপনি পুরোপুরি পার পেয়ে যাবেন কিনা! কেন্দ্রে যে আবার একটা অন্যরকম সরকার। আপনার কেসটা মনিরুল, আরাবুল, অনুব্রতদের মতো রাজ্যের মধ্যে আটকে রাখা না গেলে একটু চিন্তা আছে বৈকি!

তবে দাদা, আসল দোষ যাদের তাদের কিন্তু পুলিশ এখনও কিছু বলছে না। মুখ্যমন্ত্রী বলে দেওয়ার পরও না। আমার কথা হচ্ছে, নেতা কিংবা অভিনেতা যখন বলছেন তখন সেটা মন দিয়ে না শুনে মোবাইলে ছবি তোলা কি অপরাধ নয়? কোনটা অপরাধ, কোনটা নয়, তা বিচার করবে আইন। আমি শুধু একটা কথা বলি। দিদির কথা শুনে চলুন। এবার থেকে যখন বিরোধীদের খুন, ধর্ষণের হুমকি দেবেন তখন দেখে নেবেন আশপাশে মোবাইল ফোন আছে কিনা।

— **সুন্দর মৌলিক**

দেশের হাল ফিরবে কোন পথে

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রায় তিন দশক পর কেন্দ্রে একটি দল ক্ষমতায় এসেছে। তার সঙ্গে বয়ে এনেছে ১২০ কোটি জনতার বিপুল প্রত্যাশার চাপ। স্বল্প মেয়াদে এত প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব কিনা, বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোনো একটি রাজনৈতিক দলের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায়ন দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা— সেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। তবে নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই যে বর্তমান সরকারকে বিগত সরকারের মতো নীতিপঙ্গুত্ব নামক একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগতে হবে না।

যখন একটি নতুন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে তখন তার আর্থিক নীতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে; বিশেষ করে এমন একটি সময়ে যখন দেশের অর্থনীতি টালমাটাল অবস্থায়। আজকের অবস্থাকে অনেকটা স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত ভারত সরকারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল রাষ্ট্রের পুনর্গঠন— আয় ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে সমতা

জনগণকে এটাও বোঝানো শক্ত যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কিছু জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু ঘোষণা করে তাদের মধ্যে বিনা পয়সায় সাইকেল বিতরণের চেয়ে ঢের ভালো সেই পয়সায় 'সোনালি চতুর্ভুজ' এবং 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'র মতো প্রকল্পের মাধ্যমে শহরে, এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামেও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

আনয়ন, দারিদ্র্যদূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প এবং সর্বোপরি একটি রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো প্রবর্তন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গৃহীত হয়েছিল অর্থনৈতিক নীতি। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপেও সরকার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিল। দীর্ঘ চার দশক চলার পর প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই নীতি অলাভজনক হয়ে উঠল। বাড়ল অদক্ষতা, দেখা দিল অনুৎপাদন। আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসাম্য দূর করতে গিয়ে তা আরও প্রকট হয়ে পড়ল। অপদার্থতা, অদক্ষতা, দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি ভারতীয় অর্থনীতিতে পাকাপাকি ভাবে চেপে বসতে শুরু করল। শুরু হলো ভরতুকি ব্যবস্থার, চলল পাইয়ে দেবার রাজনীতি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে পূর্বতন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর উদার অর্থনীতি ভারতীয় অর্থনীতির প্রাণসঞ্চার করেছিল। কিন্তু অচিরেই তা ভোটসর্বস্ব রাজনীতির চোরাবালিতে পথ হারিয়ে ফেলে আর এর সিংহভাগ কৃতিত্ব জাতীয় কংগ্রেসের বৈকি! তাই আজ 'মোদী সরকারের' কাছে প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন। বিভিন্ন আলোচনায় মোদীজী অকপট স্বীকার করেছেন যে কংগ্রেস বিধ্বস্ত গুজরাটে অনুন্নয়নের গর্ত বোজাতে তাঁর অনেক সময় লেগে গেছে। বিগত দুটি ইউপিএ সরকারের দুর্নীতি ও মূল্যবৃদ্ধি রুখতে ব্যর্থতা, শিল্প ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অপদার্থতা এবং অপরদিকে উন্নয়নের মন্ত্রকে হাতিয়ার করে মোদীজী আজ ক্ষমতায় এসেছেন। তাই তাঁর কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। আজকের ভীষণ প্রতিযোগিতামূলক ভোটসর্বস্ব রাজনীতির অঙ্গনে দাঁড়িয়ে, জনমোহিনী অর্থনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে, সংস্কারমুখী অর্থনীতি গ্রহণ করাটা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ স্বল্পকালে এর সুফল মেলা শক্ত এবং জনগণও এই পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। জনগণকে এটাও বোঝানো শক্ত যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কিছু জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু ঘোষণা করে তাদের মধ্যে বিনা পয়সায় সাইকেল বিতরণের চেয়ে ঢের ভালো সেই পয়সায় 'সোনালি চতুর্ভুজ' এবং 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'র মতো প্রকল্পের মাধ্যমে শহরে, এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামেও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। বাজপেয়ীজীর সুশাসনের পরেও যে দশ বছর বিজেপিকে বিরোধী আসনে থাকতে হয়েছে, এটাও তার একটি বড় কারণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে। তাই উন্নয়নের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি আজ পেছনের সারিতে স্থান পেয়েছে।

আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সরকারের আমলে শিক্ষার প্রসার, দারিদ্র্যদূরীকরণ ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির তাগিদে অসংখ্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযান, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, বিধবা বার্ধক্যভাতা, কন্যাশ্রী, গীতাঞ্জলি, ১০০ দিনের কাজ, সংখ্যালঘু বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি বহু প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকল্পগুলির সুফল গরিব মানুষের মধ্যে পৌঁছয়নি। কিছু প্রকল্পে স্বল্পমেয়াদি অল্পবিস্তর ফল মিললেও আমরা জানি যে সেগুলি দীর্ঘমেয়াদি সুফল দেবে না। আমজনতার করের টাকায় সরকারের খয়রাতি প্রকল্পের সিকিভাগও যে আমজনতার কাছে পৌঁছয় না তা সকলেই সুবিদিত। সিংহভাগ অর্থ মাঝপথে নেতা ও আমলাতন্ত্রে বিলীন হয়। পাইয়ে দেবার রাজনীতি এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে,

দশ বছর শাসনকালের শেষদিকে তাঁর সরকারের অপদার্থতা ঢাকতে এবং সস্তা জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে মনমোহন সিং বিনা পয়সায় ভারতবাসীর হাতে মোবাইল তুলে দেবার কথাও ঘোষণা করেন। আর এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে মোদীজী বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় প্রশ্ন তুলেছেন— বিনা পয়সায় মোবাইল তো দেবেন, মোবাইল রিচার্জ করবে কে?

এ যাবৎ ভরতুকি ফিসক্যাল পলিসির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হোত যার মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস ও আয়ের সুষম বণ্টন, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া ক্ষেত্র ও মানুষদের মধ্যে কল্যাণমূলক কাজের সম্প্রসারণ ইত্যাদি। সস্তা রাজনীতির স্বার্থে এই ভরতুকি ব্যবস্থাকে অকাতরে ব্যবহার করা হয়েছে পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে, যার আওতা থেকে সংরক্ষণও বাদ যায় না। আর এই দুষ্টচক্র থেকে বিগত ইউপিএ সরকার যে পরিত্রাণ পায়নি তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে— বছরে ভরতুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের সংখ্যা কমিয়েও শেষ পর্যন্ত রাজনীতির চাপে তাঁরা তা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, সাবালক গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক হিসেবে ভারতবাসীরও বোঝবার সময় হয়েছে যে ভরতুকি ব্যবস্থাকে আপাতভাবে কল্যাণমুখী মনে হলেও দীর্ঘকালে তা তাদের জন্য কবর খোঁড়ার নামান্তর মাত্র। এও ধ্রুবসত্য যে সংরক্ষণের মানদণ্ড আর্থিক অনগ্রসরতা না হয়ে বিশেষ জনগোষ্ঠী হলে আখেরে তা শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করবে। সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতিতে মোদীজীর প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'গুজরাট মডেল' নামক একটি তত্ত্বও পরিচিত লাভ করে। বিরোধী দলগুলি নির্বিচারে তার বিরোধিতা করে প্রশ্ন তুলেছিল যে গুজরাট মডেল গুজরোটে সফল হলেও সেটি যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সাফল্য পাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? আসলে গুজরাট মডেল একটি জনদরদি সরকারের উন্নয়নের সফল বাস্তবায়নের ইতিহাস। জনমোহিনী রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে মোদীজী সরকারি পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগ করেছেন। গ্রামে কর্মসংস্থানের নামে অর্থের অপব্যয় না করে সেই অর্থের খানিকটা ব্যয় করেছেন কৃষি, সেচ ও প্রযুক্তি উন্নয়নে। নতুন শিল্প স্থাপন ও তার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলেছেন। সুনিশ্চিত করেছেন উৎপাদিত পণ্যের লাভজনক বিপণন। বাড়িয়েছেন প্রশাসনিক দক্ষতাও। কিছুদিন আগে মোদীজী বিষয়টি নিজেই স্পষ্ট করেছেন। একবার তিনি সেলুনে গিয়ে স্বয়ংক্রিয় দাঁড়ি কামানোর যন্ত্র দেখেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মাথায় খেলে যায় কীভাবে এটিকে তাঁর রাজ্যে পশুপালনে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। তাঁর সরকার সুলভ সুদে পশুপালকদের যন্ত্রটি কেনার জন্য ঋণ দেন। পশুপালকরা যন্ত্রটি ব্যবহার করে অনেক কম পরিশ্রমে ভেড়ার লোম কাটতে সক্ষম হন। এর ফলে একদিকে যেমন উৎপাদনশীলতা বাড়ে, তেমনি অন্যদিকে লোমের দৈর্ঘ্য বড় হওয়ায় পশুপালকরা উৎপাদিত পণ্যের ভাল দাম পায় যা দিয়ে অতি সহজেই তাঁরা তাঁদের ঋণ মেটাতে সক্ষম হন। তাই আজ উন্নয়নের লক্ষ্যে তত্ত্বের সফল বাস্তবায়ন অনেক বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

সঠিক সময়ে সঠিক ঋণনীতি গ্রহণে ব্যর্থতার দরুন, ইউপিএ সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও শিল্পে বৃদ্ধি— এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে যেভাবে ল্যাজেগোবরে হয়েছিল, তাতে সরকারি অদক্ষতা ও অপদার্থতায় দিনের পর দিন শিল্প ও বাণিজ্য মহল হতাশ হয়েছে। শিল্পোৎপাদন কমেছিল, বেড়েছিল চলেছে আমদানির বহর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ভারতের বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য শরিক চীনের সঙ্গে বাণিজ্য প্রসঙ্গে পিছিয়ে পড়েছে ভারত। শেষ আর্থিক বছরে ভারতে চীনের রপ্তানি ৫ হাজার ৪৩০ কোটি মার্কিন ডলার, যেখানে চীনে ভারতের রপ্তানি মাত্র ১ হাজার ৩৫২ কোটি ডলার। চলতি খাতে লেনদেনের ঘাটতি মাত্রা ছাড়িয়েছে। পড়ে চলেছে টাকার দাম, মার খেয়েছে আর্থিক বৃদ্ধির হার। ঘটেছে একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারি, আর বেড়েছে প্রশাসনিক খরচের বহর। কর্মসংস্থান বাড়াতে প্রায় কিছুই পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কেলেঙ্কারি আর কালোবাজারির কলঙ্ক ঢাকতে দেদার হাতে জনগণের করের টাকায় চলেছে খয়রাতি। প্রশাসনিক গাফিলতিতে একের পর এক ঘটেছে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ। দুর্বল সরকারের ব্যর্থ বিদেশনীতির সুযোগে শত্রুরাষ্ট্রগুলি অকৃপণভাবে ভারতে সন্ত্রাসবাদ রপ্তানি করেছে, যা রুখতে প্রতিরক্ষাখাতে অপচয় হয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। পরোক্ষে দুর্বল হয়েছে ভারতীয় অর্থনীতির ভিত।

দেশের বিকাশ করতে প্রয়োজন পড়ে না ভারী ভারী উন্নয়ন তত্ত্বের, না প্রয়োজন পড়ে রকেট উদ্ভাবনী বিজ্ঞানের (Rocket Science)। আর এস এসের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর) তাঁর 'চিন্তাচয়ন' (Bunch of thoughts) গ্রন্থে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, যে-কোনো সরকারই চলতে পারে যদি সেই সরকার পরিচালনকারী মানুষগুলি সৎ ও নিঃস্বার্থ হয়। সবকিছুর মূলে রয়েছে সংশ্লিষ্ট মানুষদের উৎকর্ষ। এই প্রসঙ্গে তিনি উপস্থাপিত করেছেন যুদ্ধোত্তর জাপান ও পশ্চিম জার্মানির দৃষ্টান্ত। যে জাপান পরমাণুবোমার আঘাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, সেখানে এমন দুর্দান্ত অগ্রগতি ঘটেছে যে আমেরিকা পর্যন্ত জাপানের বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারছে না। জার্মানিরও প্রায় সমগ্র শিল্প সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তাদের ভূমিতে অবস্থানরত বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণের মাধ্যমে যুদ্ধের সময়ের ঋণ পরিশোধের বিরাট বোঝা তাদের উপর চেপে বসেছিল। এই সমস্ত দুঃখ-দুর্বিপাকের উপরে যুদ্ধের পর তাদের দেশকেই দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও জার্মানরা হতাশায় ভেঙে পড়েনি।

একমাত্র দেশাত্মবোধের উৎসাহ ও দেশবাসীর শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মদ্যোগের শক্তিতেই তারা আবার বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সারিতে স্থান পেয়েছে। এই দেশভাবনা জাগিয়ে তুলতে চাই সুযোগ্য নেতৃত্বের, যিনি বা যাঁরা হবেন সৎ, নির্লোভ ও জনদরদি। চাই দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ও সুদক্ষ প্রশাসন।

একটি বলিষ্ঠ ও স্বাভিমানী নেতৃত্বই পারে ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে। আর যে কাজে ইতিমধ্যেই অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। ■

ইউপিএ সরকারের আমলেই বাড়বাড়ন্ত দেশবিরোধী এনজিও-গুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের উন্নয়নের রথকে থমকে দিতে বিশাল অঙ্কের টাকা বিদেশ থেকে আসছে এদেশের কিছু বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (এন জি ও)-র হাতে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় হচ্ছে এদেশের মানুষকে খেপিয়ে তুলে দেশের উন্নয়নমুখী বৃহৎ প্রকল্পগুলির কাজ থমকে দিতে। ঘটনার সূত্রপাত, গত ১০ মার্চ। লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি চলাকালেই অস্ট্রেলিয়ার গ্রীনপীস ইন্টারন্যাশনাল একটি রিপোর্ট পেশ করে— 'আদানি'জ রেকর্ড অব্ এনভায়রনমেন্টাল ডেস্ট্রাকশান অ্যান্ড নন-কমপ্লিয়েন্স ইউথ রেগুলেশন'। গত ৩ জুন আই বি গ্রীনপীস-সহ বেশ কিছু এনজিও এবং বিদেশী অর্থদাতাদের নামোল্লেখ করে জানায়— ভারতের উন্নয়নের রথের চাকাকে থমকে দিতে এরা চক্রান্ত করছে। গোয়েন্দাদের বক্তব্য— এদের টার্গেট নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট, ইউরেনিয়াম খনি, কয়লা নির্ভর পাওয়ার প্লান্ট, বড়ো শিল্প প্রকল্প (যেমন পস্কো ও বেদান্ত), হাইডেল প্রকল্প (নর্মদা সাগর ও অরুণাচলপ্রদেশে) এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নিষ্কাশন শিল্পের ওপরে। ভারতের পরিচয়বাহী এই শিল্পগুলির যাবতীয় কাজকর্ম থমকে দিতে স্থানীয় মানুষকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে মদত যোগাচ্ছে গ্রীনপীস ইন্টারন্যাশনাল, কর্ডেড (CORDAID)-এর মতো এনজিও-গুলি। সাধারণ মানুষকে অর্থের প্রলোভনে তাদের ছাতার তলায় আসতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে আই বি সূত্রে খবর।

কুড়ানকুলাম নিউক্লিয়ার প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

আই বি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, এই এনজিও-গুলির বাড়বাড়ন্ত শুরু হয় বিগত ইউপিএ সরকারের আমলেই। যার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিল ২০১২ সালে। যখন রাশিয়া নির্মিত কুড়ানকুলাম নিউক্লিয়ার প্রকল্পের বিরুদ্ধে এনজিও-গুলি একযোগে আন্দোলন শুরু করে। ইউপিএ সরকারের কাছে যে এ-সংক্রান্ত কোনো খবর ছিল না, বিষয়টা এমনও নয়। গোয়েন্দাদের বক্তব্য, ২০১১-য় জাপানে ফুকুসিমা বিপর্যয়ের পর স্থানীয় সূত্রে সরকারের কাছে খবর গিয়েছিল যে দুটি হাজার মেগাওয়াট রিঅ্যাক্টর পরিচালনার বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করার জন্য বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য আসছে। এই পাওয়ার প্লান্টের বিরুদ্ধে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের খেপিয়ে তোলার জন্য নিউক্লিয়ার-বিরোধী এনজিও-গুলির হাতে সেই অর্থ পৌঁছে গিয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও সরকার নড়েচড়ে বসেনি।

পি. চিদাম্বরম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন এই কুড়ানকুলাম- বিরোধী আন্দোলন চরম আকারে পৌঁছয় আম-আদমি পার্টির নেতা এস পি উদয়কুমারের নেতৃত্বাধীন পিপল মুভমেন্ট এগেনস্ট নিউক্লিয়ার এনার্জি (পি এম এ এন ই) নামের মঞ্চের মাধ্যমে। এর পেছনেও বিপুল বিদেশি অর্থ ছিল বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর। কিন্তু এত টাকা ছড়িয়েও স্থানীয় জনভিত্তি বিশেষ কেনা যায়নি। যে কারণে সাম্প্রতিকতম লোকসভা নির্বাচনে উদয়কুমারের শোচনীয় হাল হয়েছে। কন্যাকুমারিকা কেন্দ্রে তাঁর মাত্র পনেরো হাজার ভোট। আর এই ভোট পেয়ে তিনি ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছেন।

অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিকে থমকে দিতেই আন্তর্জাতিক স্তরে এই চক্রান্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের ক্রমাগত জিডিপি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত বৈদেশিক শক্তি এধরনের চক্রান্ত করে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর ডাচ সরকারের অনুদান প্রাপ্ত কর্ডেড নামক এনজিও-টি গত বছর শিলং-এ উত্তর-পূর্ব ভারতের বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ওই প্রশিক্ষণে দেশের প্রশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করার কলাকৌশল শেখানো হয়। প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিল দু'জন ডাচ ও একজন মার্কিন নাগরিক। সূত্রের খবর, তারা সর্বক্ষণ প্রশিক্ষণ- প্রাপ্তদের মনে করিয়ে দিতে থাকে যে উত্তর-পূর্বে যে তৈলখনি রয়েছে তা সমগ্র আরব দুনিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। এবং তা স্থানীয় জনজাতিদের জন্যই সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। মণিপুরে তৈল-নিষ্কাশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করতে স্থানীয় এনজিও-গুলোকে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু এনজিও-র

তৎপরতা আগেই গোয়েন্দারা টের পেয়েছিলেন। বিশেষ করে মণিপুর থেকে আফস্পা (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পুলিশ অ্যাক্ট) প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টিতে এরা প্ররোচিত করছিল। মূল উদ্দেশ্য তেলের এই উৎস থেকে দেশের সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে সেখানে একাধিপত্য কায়েম করা।

এই আই বি রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত সরকারের এধরনের ভারত-বিরোধী এনজিও-গুলির কাজকর্মকে রোখার ব্যাপারে কতটা সদিচ্ছা ছিল বা আদৌ ছিল কি না সেই প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই উঠছে। আই বি রিপোর্ট-ই বলছে যে গ্রীনপীস ইন্টারন্যাশনাল বরাবরই ভারতের পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্পগুলিকে টার্গেট করেছিল। তাদের পরিকল্পনাই ছিল নতুন কয়লা চালিত প্লান্ট হতে না দেওয়া, আর পুরোনোগুলি বন্ধ করা। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১০-১১ বর্ষেই গ্রীনপীস তার অ্যান্টি সি এফ পি সি (কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্লান্ট)-র কর্মসক্রিয়তা বাড়াতে থাকে। ২০১২-র জুলাইয়ে ইস্তানবুল কোল স্ট্র্যাটিজি কনফারেন্সে যা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ওই কনফারেন্সে একটি মার্কিন সংস্থা ক্লাইমেট ওয়ার্কস ফাউন্ডেশন তাদের গবেষণায় জানায় সি এফ পি পি বিরোধী আন্দোলনের জন্য এই মুহূর্তে ভারত-ই সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। তাদের হিসেবে সারা বিশ্বের ৯৯৯টি প্রস্তাবিত সি এফ পি পি-র মধ্যে ৪৫৫টিই ভারতে। অপর একটি মার্কিন এনজিও কোলসওয়ার্ম ভারতের ৫৪২টি কয়লা-প্লান্টের একটি বিস্তারিত মানচিত্র তুলে ধরে তাদের ওয়েবসাইটে। পরিস্থিতির মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে গ্রীনপীস একটি বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করে যে ২০১১-১২ বর্ষে ভারতের ১১১টি সি এফ পি পি-র জন্য নাকি ১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ব্যাঙ্গালোরে তাদের প্রধান কার্যালয় থেকে গ্রীনপীস এই মিথ্যাচার চালিয়ে গেলেও তৎকালীন ইউপিএ সরকার এই ভারত-বিরোধী এনজিও-টির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। কূটনীতিকরাও মনে করছেন বিগত ইউপিএ সরকারের অতি নরম মনোভাবের জন্যই এই এনজিও-গুলির চূড়ান্ত বাড়-বাড়ন্ত হতে পেরেছে। যে কারণে আম-আদমি দলের নেতা উদয়কুমারকে জনৈক জার্মান নাগরিক সমস্ত নিউক্লিয়ার প্লান্ট ও ইউরেনিয়াম খনির অবস্থান সমেত একটি মানচিত্র দিলেও তারা দু'জনেই পার পেয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশের সিঙ্গরাউলি-তে ১৫ হাজার মেগওয়াটের বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধেও এই সমস্ত এনজিও-গুলি একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একাজে বিদেশী এনজিও-গুলোর পাশাপাশি পাঁচ ভারতীয়কেও চিহ্নিত করেছে আই বি। এরা হলো বন্দনা শিবা, সুমন সহায়, অরুণা রডরিগেজ, প্রশান্ত ভূষণ এবং কবিতা কুরুগাঁতি। বিটি বেগুন-চাষের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও এরা ছিল।

নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় এই দেশ-বিরোধী শক্তি আরও মরিয়া হতে পারে বলে অনুমান। কারণ নতুন ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন দেশবাসী আর তাতেই প্রমাদ গুনেছে এইসব বিদেশী শক্তি। এমনিতেই আই বি রিপোর্ট বলছে যে চলতি আর্থিক বছরে গ্রীনপীসের পরিকল্পনা হলো ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতের পাম তেল আমদানির বিরোধিতা করা। এবং শহর এলাকায় যে কোনও নির্মাণ ও ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার ই-বর্জ্য নিষ্কাশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। তবে বিগত জমানার মতো বর্তমান সরকারের আমলে তাদের এই পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়িত করা যাবে কি না তা নিয়ে খোদ গ্রীনপীসের কর্তাব্যক্তিরাই সন্দিহান। ■

Sharada Travels

Member of: TAAB Travel Agents Association of Bengal

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

ভ্রমণ	মূখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভযাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
পুরী	ভুবনেশ্বর, নন্দনকানন, ধবলগিরি, খন্ডগিরি, লিঙ্গরাজ মন্দির, কোনারক	৬	১লা সেপ্টেম্বর ২০১৪	৩৮০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লক্ষ্মণঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৪	৫৮০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর ৭০দিন আগে বুকিং করুন

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস) লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স, গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ী ভাড়া।

কেন্দ্র বে-সরকারি সংস্থাগুলির বিদেশী খয়রাতি বন্ধ করে দিচ্ছে

তারক সাহা

কেন্দ্রের নতুন সরকার দেশে ছড়িয়ে থাকা ২২টি বিদেশী মদতপুষ্ট বে-সরকারি সংস্থার (এন জি ও) ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে। গোয়েন্দা ইডি সূত্রের খবর যে, এই ২২টি সংস্থার মধ্যে ১১টি সংস্থা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরে তাদের আবশ্যিক পঞ্জীকরণ— ফরেন কনট্রিবিউশান (রেগুলেশন) অ্যাক্ট (এফ সি আর এ) করিয়েছে। এই পঞ্জীকরণ তারাই করায় যারা 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেটরি অ্যাক্টের' আওতাভুক্ত। কিন্তু এই ১১টি সংস্থার (যাদের নাম এই আইনের আওতাভুক্ত) কেউই সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক ২০১৩-১৪ সালের কোনো হিসেব পেশ করেনি। গোয়েন্দাসূত্র অনুসারে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এই সংস্থাগুলি নানা ছুতোনাতায় সরকারি উন্নয়ন কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। শুধু নতুন সরকার নয়, সদ্য প্রাক্তন হওয়া মনমোহন সরকারও এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিল। পূর্বতন সরকার ২০১০ সালে এই আইনটি বলবৎ করতে চেয়েছিল।

বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি আমেরিকা-সহ বিভিন্ন স্ক্যান্ডিভিয়ান দেশগুলি থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। মনমোহন সিং বিভিন্ন সময়ে বলেছেন যে, এই সংস্থাগুলি জেনেটিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে কিংবা কুডানকুলামে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বাধাদান করেছে। এই সব সংস্থাগুলি ২০০৮-০৯ থেকে ১২-১৩ এই পাঁচ আর্থিক বছরে মাত্র ৬৫০ কোটি টাকা প্রাপ্ত সাহায্যের হিসেব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পেশ করেছে। যে ১১টি বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা বিভিন্ন সময়ে সরকারি উন্নয়ন কাজে বাধা দিয়ে এসেছে তাদের তালিকা—

■ **তুতিকোরিন মালটিপারপাস সোশ্যাল সার্ভিস সোসাইটি :** এই সংস্থাটি তামিলনাড়ুর কুডানকুলাম পরমাণু সংস্থা স্থাপনের বিরোধিতা করছে। ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে এবং ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে ইতালীয় সংস্থার কাছ থেকে যথাক্রমে ১০.৮৭ কোটি এবং ৫.২৬ কোটি টাকার অনুদান পেয়েছে।

■ **তুতিকোরিন ডায়শেসন অ্যাসোসিয়েশন :** সংস্থাটি কুডানকুলাম আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। ১৯.১৮ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে উল্লেখিত পাঁচ আর্থিক বছরে। ৩.১৩ কোটি টাকা এসেছে

বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি আমেরিকা-সহ বিভিন্ন স্ক্যান্ডিভিয়ান দেশগুলি থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। মনমোহন সিং বিভিন্ন সময়ে বলেছেন যে, এই সংস্থাগুলি জেনেটিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে কিংবা কুডানকুলামে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বাধাদান করেছে। এই সব সংস্থাগুলি ২০০৮-০৯ থেকে ১২-১৩ এই পাঁচ আর্থিক বছরে মাত্র ৬৫০ কোটি টাকা প্রাপ্ত সাহায্যের হিসেব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পেশ করেছে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

জার্মানি থেকে, ৩.৭৪ কোটি টাকা সাহায্য পেয়েছে ইতালি থেকে, সংস্থাটিকে ৪.১০ কোটি টাকা খয়রাতি দিয়েছে ফ্রান্স। এদের আরেকটি চ্যানেল ফ্রান্সের ক্যাথলিক সংস্থাটি ৩.৯২ কোটি টাকা দিয়েছে।

▯ **জিন আন্দোলন :** জি এম কর্পোরেশন ভারতে জিন আন্দোলনের পুরোধায় থেকে বিদেশী সাহায্য পেয়ে এসেছে। গোয়েন্দা সূত্র বলছে যে, সংস্থাটি বিভিন্ন সময়ে ইতালি, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, ইউকে, কানাডা থেকে মোট ৫.৪৫ কোটি টাকার সাহায্য পেয়েছে।

▯ **নবোদয় ট্রাস্ট :** এই সংস্থার কর্ণধার বন্দনা শিবা। গোয়েন্দা সূত্রের মতে তাঁর ট্রাস্টের জন্য কানাডা, ইতালি, জার্মানি, আমেরিকা, ইউকে, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড থেকে আর্থিক অনুদান আদায় করেছেন ১২.৭৮ কোটি টাকা। আর সেই অর্থেই ওই ট্রাস্ট সরকারি জিন বীজের চাষের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছে।

▯ **ইন্ডিয়ান সোশ্যাল অ্যাকশন ফোরাম :** নতুন দিল্লীর কাটওয়ারিয়া সারাইয়ের ঠিকানায় যে চারটি সংস্থা এনজিও চালাচ্ছে এটি তার অন্যতম। ওই পাঁচ আর্থিক বছরে ৬.৮৭ কোটি টাকার অনুদান পেয়েছে বিদেশ থেকে।

▯ **অ্যাকশন এইড :** গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে ওড়িশার রায়গড়, কালাহান্ডি অঞ্চলের বনবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সক্রিয় সংস্থাটি। ২০০৮-১৩ এই অর্থবর্ষে সংস্থাটি ইউকে-র সংস্থা অ্যাকশন এইড ইন্টারন্যাশানাল থেকে ৩৬৪.৪৭ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

▯ **ইস্ট কোস্ট রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট :** গৃহমন্ত্রককে এরা যে হিসেব পেশ করেছে তাতে কুড়ানকুলাম বিরোধী আন্দোলনে সামিল সংস্থাটি ১৮.৩৫ লক্ষ টাকা পেয়েছে বিদেশ থেকে।

▯ **গান্ধীয়ান ইউনিট ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এডুকেশন :** কুড়ানকুলাম বিরোধী সংস্থাটি ওই আর্থিক বছরগুলিতে ১.৬৩ কোটি টাকা বিদেশ থেকে পেয়েছে।

▯ **মালধারী রুরাল অ্যাকশন গ্রুপ :** উন্নয়নে গুজরাট মডেল বিরোধী সংস্থাটি ২০০৯-১০ এবং ২০১১-১২ আর্থিক বছরে তিব্বত, কানাডা, ইউএসএ, নরওয়ে, ইতালীয় সংস্থার এজেন্ট থেকে ৪.০৫ কোটি টাকার সহায়তা পেয়েছে।

▯ **অক্সফাম :** সংস্থাটি উল্লেখিত সংস্থাগুলিতে বিদেশী খয়রাতি পৌঁছে দেয়। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি— সংস্থাটি ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, স্পেন এবং হংকং থেকে ১৮৮.৮২ কোটি টাকা আদায় করেছে ওই পাঁচ বছরে।

▯ **গ্রীনপীস ইন্টারন্যাশানাল :** চেন্নাই-এ রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থাটি পাঁচ বছরে ৩২.৯৩ কোটি টাকা পেয়েছে মূলত গ্রীনপীসের নেদারল্যান্ড অফিস থেকে। এছাড়া জার্মানি এবং বেলজিয়াম থেকেও অনুদান পেয়েছিল।

আমরা উপরের আলোচনায় দেখলাম যে, দেশজুড়ে এইসব এনজিও-গুলি বিদেশী অর্থানুকূল্যে দেশে বসে সরকারের উন্নয়ন বিরোধী আন্দোলনে কলকাঠি নাড়ে। এইসব এনজিও-র কার্যকলাপে নতুন সরকার কড়া নজরদারি রাখছে বিশেষত গ্রীনপীস সংস্থাটির ওপর। এবার তাদেরও নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে যার এতদিন সরকারি নজরদারির মধ্যে ছিল না।

সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া কোনও বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত এনজিও-কে অর্থ সাহায্যের ছাড়পত্র না দেয়। যে সংস্থা গ্রিনপীস ইন্টারন্যাশনালের থেকে সহায়তা পেয়ে থাকে এবং সেই সঙ্গে ক্লাইমেট ওয়ার্কসের ক্ষেত্রে একই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হয়েছে।

এইসব এনজিও-গুলি আর যথেচ্ছ বিদেশী সাহায্য পাবে না, কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞার ফাঁস আরো বেশি করে শক্ত করছে। এক নির্দেশে মন্ত্রক বলেছে, যেসব এনজিও বিদেশী সাহায্য পেয়ে থাকে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেন তাদের কী প্রকল্প, কীভাবে ওই অর্থ ব্যয় হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে। ■

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–

emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রত্যেকটা আসনেই বিজেপি'র ভোট বেড়েছে

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র নির্বাচনী ফল আদৌ ভাল হয়নি। মোট ৪২টি আসনের মধ্যে তার হাতে এসেছে মাত্র দু'টো। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যের সব নির্বাচনেই ম্যাজিক সৃষ্টি করেছে— ৪২টি আসনের মধ্যে তার দখলে এসেছে ৩৪টি। এতদিনের কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৪টি এবং ৩৪ বছরের একচ্ছত্র আধিপত্যের পর বামফ্রন্টও পেয়েছে মাত্র দু'টো আসন। সেই ক্ষেত্রে বিজেপি দু'টো আসন পেয়েছে— এটা কম কথা নয়। বিশেষ করে, এতদিন সংখ্যাটা ছিল শূন্য। তাছাড়া সকলেই জানেন যে, এই রাজ্যে বিজেপি-র সংগঠন আদৌ মজবুত নয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা দরকার— এই রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটা আসনেই গতবারের তুলনায় বিজেপি-র ভোট অনেক বেড়েছে। এটা নিশ্চয় বেশ তাৎপর্যের বিষয়। একটু তুলনা করে দেখা যাক কীভাবে তার ভোটের শতাংশ বেড়েছে :

এটা লক্ষণীয় যে, আলিপুরদুয়ারে তার ভোটের হার সামান্য বেড়েছে— ২১.৪০ থেকে হয়েছে ২৩.৩২। আর কমেছে দার্জিলিঙে (৫১.৫০ থেকে নেমে হয়েছে ৪২.৭৫) এবং কলকাতা (দক্ষিণে) সেটা ৬৭.১৯ থেকে হয়েছে ২৫.৬৫। কিন্তু আর সব কেন্দ্রেই ভোটের হার বেড়েছে অনেক সেটা প্রায় ছয় গুণেরও বেশি হয়েছে (কেবল শ্রীরামপুর, উত্তর কলকাতা ও ব্যারাকপুরে)। সেটা দ্বিগুণ থেকে ৪-৫ গুণ বেশি হয়েছে অনেক কেন্দ্রেই।

এতে অবশ্য এটা প্রমাণিত হয় না যে, বিজেপি এই রাজ্যে এখনই একটা বিরাট রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে এবার এই দল যে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে, তার ছিটেফোঁটাও পশ্চিমবঙ্গে পায়নি। আসন সংখ্যা বা প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ দিয়ে এই রাজ্যগুলোর সঙ্গে এই ব্যাপারে কোনও তুলনাই চলে না।

কিন্তু এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, এই রাজ্যে তার ফল আগের তুলনায় অনেক অনেক ভাল হয়েছে। গত নির্বাচনের ফলাফলের কথা মনে রাখলে সেটা মেনে নিতেই হবে।

এই রাজ্যে বিজেপি-র সংগঠন অবশ্যই দুর্বল। কর্মীরও অভাব রয়েছে। তারপর রাজ্যটা এখন তৃণমূল কংগ্রেসের বড়সড় দুর্গ। এই অবস্থায় আশা করা যায় না যে, উক্ত দল অচিরেই বিরাট কিছু করতে পারবে। তবে মোদী হাওয়া কিছুটা হলেও লেগেছে। ■

রাজ্য বিজেপির প্রাপ্ত ভোট (%)

কেন্দ্র	২০০৯	২০১০
কোচবিহার	৫.৮৩	১৬.৩৩
জলপাইগুড়ি	৯.১৫	১৭.১
রায়গঞ্জ	৪.১৯	১৮.৩২
বালুরঘাট	৬.৮২	২০.৯৭
মালদহ (উত্তর)	৬.৬৮	১৫.৩৯
মালদহ (দক্ষিণ)	৫.৩০	১৯.৭৮
জঙ্গিপুর	২.৩৩	৮.৬৪
বহরমপুর	২.৯০	৭.৩৭
মুর্শিদাবাদ	৪.০২	৭.৮৪
কৃষ্ণনগর	১৬.৭৬	২৬.৩৯
রাণাঘাট	৫.০৪	১৭.২৬
বনগাঁ	৩.৯৫	১৯.৬
ব্যারাকপুর	৩.৫৬	২১.৯১
দমদম	৫.৭৯	২২.৪৯
বারাসাত	৫.৪০	২৩.৩৬
বসিরহাট	৬.৫৪	১৮.৩৬
জয়নগর	২.৬৯	৯.৪৪
মথুরাপুর	২.৬২	৫.১৭
যাদবপুর	২.৩৪	১২.২২
ডায়মন্ডহারবার	৩.৫০	১৪.৯২
কলকাতা (উত্তর)	৪.২২	২৫.৮৯
হাওড়া	৩.৮০	২২.০৪
উলুবেড়িয়া	৪.২০	১১.৫৬
শ্রীরামপুর	৩.৫৬	২২.২৯
হুগলী	৩.৪২	১৬.৪০
আরামবাগ	৪.৯৮	১১.৬৩
তমলুক	৯.৭৯	৬.৪৪
কাঁথি	২.৮৪	৮.৬০
ঘাটাল	২.৯৯	৬.৯৩
ঝাড়গ্রাম	৪.৭৪	৯.৭৩
মেদিনীপুর	৪.৯৯	১৪.২৯
পুরুলিয়া	২.৩৮	৭.১৫
বাঁকুড়া	৪.৩৩	২০.৩৯
বিষ্ণুপুর	৩.৯৮	১৪.১১
বর্ধমান (পূর্ব)	৬.৩৭	১২.৯৩
বর্ধমান (দুর্গাপুর)	৪.৪১	১৮.৪৫
আসানসোল	৫.৫৬	৩৬.৮৪
বোলপুর	৬.৫০	১৫.১৩
বীরভূম	৪.৬৩	১৮.৪৭

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

পুরভোটেও বিজেপি ভীতি

রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, পুজোর আগে পুরভোট হবে না। কারণ রাজ্যে নতুন কয়েকটি কর্পোরেশন হবে। কয়েকটি পুরসভা ওই কর্পোরেশনগুলির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সেই সব কর্পোরেশনে নতুন করে আসন বিন্যাসও করতে হবে। আর তাতে কমপক্ষে চার মাস সময় লাগবে। অতঃপর ওইসব কর্পোরেশনও বাকি দশটি পুরসভার ভোট একই সঙ্গে নভেম্বরে নেওয়া হবে। পুরমন্ত্রী একথাও জানাতে ভোলেননি যে সবে লোকসভা ভোট শেষ হয়েছে, ফলে নির্বাচনী বিধিনিষেধ থাকায় সব উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ ছিল, তাই এখনই পুরভোট করতে গেলে আবার সব কাজ থমকে যাবে। তাই সব ভোট হবে নভেম্বরেই। কিন্তু ভোট পেছানোর কারণ আরও আছে, যা পুরমন্ত্রী বলেননি। অর্থাৎ 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।' আর সেই 'কালা'— বিজেপি-র উত্থান।

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এ রাজ্যে ফুটিয়েছে দু'টি পদ্মফুল। অন্য দু'টি কেন্দ্রে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু ২৪টি বিধানসভা ও বেশ কয়েকটি পুরসভায় ওই দল রয়েছে এগিয়ে। আর এ রাজ্যে বিজেপি-র মরা গাঙে জোয়ার এনেছে নিঃসন্দেহে 'মোদী-প্লাবন'। তাই 'জয়' করে তবু 'ভয়' তাঁর যাচ্ছে না। কিন্তু নভেম্বরে ভোট হবে কি করে? ওই সময় তো স্কুলে স্কুলে বার্ষিক ও টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। তাই ভোটের কাজে যেমন শিক্ষকদের পাওয়া যাবে না, তেমনি করা যাবে না ভোটের প্রচারও। তবে কি পুরভোট হবে নীরবে, বিনা প্রচারেই? অসম্ভব নয়। ওই যে 'কত্তার ইচ্ছায় কেত্তন'! তবে বিভিন্ন দল থেকে নেতা-কর্মীরা যেভাবে দলে দলে বিজেপি-তে ঢুকছে ও জনসমর্থন বাড়ছে, তাতে নভেম্বরেও যে 'মোদি-প্লাবন' স্তিমিত হয়ে যাবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অতঃপর রয়েছে ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। তাও আবার হবে মোদী সরকারের কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষকদের কড়া নজরদারিতে। অতঃকিম্! নেত্রীর মনে রাখা উচিত, অসাংবিধানিকভাবে পুরভোট করলে নভেম্বরে— তা বাতিল হয়েও যেতে পারে। অতএব, সাধু সাবধান!

ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

সাধু সাবধান

ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্যই বেনোজল আসতে শুরু করেছে। ৭ জুন বর্ধমান থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ' পত্রিকা পড়ে জানতে পারলাম, যে সাত বারের কংগ্রেসের বিধায়ক দেওকীনন্দন পোদ্দার ও তাঁর পুত্র মনোজ পোদ্দার বিজেপি-তে যোগদান করেছেন।

আমার মনে প্রশ্ন হ'ল, যাঁরা দীর্ঘ চার দশক কংগ্রেস পার্টি থেকে সঙ্ঘ পরিবারের সংগঠনকে হিন্দু ও হিন্দুত্বের কথা বলার জন্য সাম্প্রদায়িক বলে অচ্ছুত করে রেখেছিলেন, যিনি অখণ্ড ভারত, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ অঙ্গ, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল, এক দেওয়ানিবিধি ভারতে চালু হোক বা শ্রীরামমন্দির নির্মাণের কাজ সহমত পোষণ করেন না, তাঁরা কীভাবে সঙ্ঘ পরিবারে সামিল হন? এটা চিন্তার বিষয়, 'ডাল মে কুচ কালা নেই তো'? ওই সব ব্যক্তিদের প্রতিজ্ঞা বা লিখিত মুচলেকা নেওয়া উচিত। কারণ তাঁরা দল পরিবর্তন করা ব্যক্তি। আমার জেলা সদর শহর সিউড়ীতে পৌরসভার কতিপয় পৌরপিতা, যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য, তাঁরা এখন বিজেপি-তে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টায় আছেন। আমি একজন স্বয়ংসেবক হওয়ার জন্য বিজেপি-র জেলা সভাপতি দুধকুমার মণ্ডলকে সতর্ক করে দিয়েছি। কারণ এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব মনে করি। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র কার্যকারিণী সমিতির কাছে বিনম্র অনুরোধ, এঁদের থেকে সাবধান থাকা বাঞ্ছনীয়।

লক্ষ্মণ বিষ্ণু,
সিউড়ী, বীরভূম।

জ্যোতি বসুর যোগ্য উত্তরসূরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ মনে পড়ে ১৯৮৯ সালে পূজার ঠিক পূর্বে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মারা যান। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। সেই সময় সামান্য সৌজন্যটুকু তিনি জানাননি। অথচ ১৯৭২-৭৭ সালে যখন সিপিএম সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তথা ইন্দিরা গান্ধীর ভয়ে ইঁদুরের গর্তে ঢুকে গিয়েছিল তখন জনতা পার্টির নেতা প্রফুল্লবাবুর হাত ধরে আবার সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর ভুল পদক্ষেপের ফলে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার জ্যোতিবাবুর জন্মদিনে শুভেচ্ছা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করে এসেছেন এবং জ্যোতিবাবু বলেছিলেন আগামীদিন তোমার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিই জ্যোতিবাবুর যোগ্য উত্তরাধিকারী। নচেৎ যে তপন সিকদার তাঁর সঙ্গে বাজপেয়ীজীর মন্ত্রিসভায় ছিলেন এবং তাঁর পরিচালনায় ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে মমতাজীর সঙ্গে বিজেপি সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছিল সেই তপন সিকদারের মৃত্যুতে তিনি কোনো প্রকার শোক জ্ঞাপন বা সরকারের তরফে পুষ্পস্তবকও তাঁর মরদেহে দেওয়া হয়নি। সত্যি মমতাদি আপনাকে যত দেখি তত বিস্ময় লাগে! এই সেই মমতা যাঁর ১৯৯০ সালে জ্যোতিবাবুদের হাতে মার খেয়ে জীবন সংশয় হতে চলেছিল কিংবা এই মমতা ২৬ দিন অনশন করেছিলেন বুদ্ধবাবুর ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে।

কমল মুখোপাধ্যায়,
চুঁচুড়া, হুগলী।

রাজ্য বিজেপি-র নির্বাচনী সাফল্য এবং পরবর্তী সঙ্কট

দেবীপ্রসাদ রায়

বিজেপি-র দীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত হলেও প্রায় অভাবিত এই বিপুল জয় আনন্দ ও উত্তেজনার সঙ্গে সারাদেশে অভ্যর্থিত হয়েছে মানুষের দ্বারা এমন ভাবে যে অভিজ্ঞ ছিদ্রান্বেষীরাও এই জয়কে সামান্য হেয় প্রতিপন্ন করার কোনো ছিদ্র খুঁজে পাচ্ছেন না। এই রাজ্যেও ১৭ শতাংশ ভোট বৃদ্ধিতে আলোড়িত হয়েছে বিজেপি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্য পাবার হাতছানিতে। কিন্তু এই সাফল্যও এক সঙ্কটের মুখোমুখি— তা হলো বিভিন্ন দল থেকে বিজেপি-তে ঢোকার চেষ্টা। আপাতত ভাবে সীমিত সংগঠনকে ব্যাপক করার সম্ভাবনায় উদ্বেলিত হলেও বিজেপি-কে ভাবতে হবে গুরুত্বের সঙ্গে এই সব নবাগতদেরকে বিজেপিতে নির্দ্বিধায় ঠাঁই করে দেওয়া হবে কিনা, উচিত কিনা। আমরা দেখেছি কীভাবে হিংস্র ও সন্ত্রাসের দর্শনে লালিত পালিত সিপিআইএম-এর সম্পদ ব্যক্তিরা তৃণমূলে ঢুকে তৃণমূলের মূল কর্মীদেরকে কোণঠাসা করে তাড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দখল নিয়ে তারই সর্বোচ্চ নেতৃত্বের প্রশ্রয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের প্রশ্রয়িত দামাল ছেলেরা এবং সিপিআইএম থেকে আগত হার্মাদরা মিলেমিশে তৈরি করেছে আর এক হার্মাদবাহিনী যার দাপটে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে বামফ্রন্ট আমলের কলুষ থেকে মুক্তি পাবার সব সম্ভাবনাকে শূন্যে বিলীন করে দিচ্ছে— কী ভাবে, প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষ তা দেখছে।

ঠিক এই সময় আবার বিজেপিতে ঢোকার অনুরূপ চেষ্টা বিজেপিকে অনুরূপ ভাবেই কলুষিত করবে কিনা তা নিয়ে ভীত সাধারণ মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকায় হতাশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষ, তারা 'খড়কুটো' বিজেপিকে গড্ডলিকা স্রোতে ভেসে যেতে দিতে চায় না। তা হলে কী করা উচিত? অযাচিত এবং বোধ হয় নেতৃত্বের কাছে অবাঞ্ছিতও সাধারণ মানুষ একটা উপায়ের কথা ভাবছে— তার কথা জানাই।

এই দল-পরিবর্তনে ইচ্ছুক মানুষদের সরাসরি বিজেপিতে না ঢুকিয়ে একটা ফিল্টার (ছাঁকনি) ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আনার কথা ভাবুক বিজেপি নেতৃত্ব। অবশ্যই জাতীয়তাবাদী, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব, এতদিন ধরে যাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তাঁদের জন্য বিশেষ চিন্তাভাবনা থাকতেই পারে। এই ছাঁকনি ব্যবস্থা চালু করা হোক একটি সংগঠনমঞ্চ তৈরি করে যার নাম হতে পারে 'জনতা সহায়ক সমিতি'। বিভিন্ন স্থানে বিজেপি-তে আসতে ইচ্ছুকদের প্রাথমিক ঠাঁই দেওয়া হোক এই সমিতিতে বিজেপি কর্মীর নেতৃত্বে। এদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি স্থানীয় ভিত্তিতে ঠিক করে দেওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। গরিব অসহায় মানুষদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের নানারকম প্রকল্প আছে। এই সব প্রকল্পে আসতে চাওয়া মানুষরা বিভিন্ন 'আমলাতান্ত্রিক' প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে গিয়ে বড়ই বিব্রত হচ্ছে— হয়রান হচ্ছে। তাদের সাহায্য করার জন্য কিছু সেবা প্রদানের মানুষ দরকার। উপরোক্ত প্রস্তাবিত সমিতি 'নতুন'দের নিয়ে এই কাজ করতে পারে।

যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ঠিক এই মুহূর্তে সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তর থেকে 'বিধবাভাতা' প্রাপকদের কাছে বিজ্ঞপ্তি এসেছে বিশেষ ধরনের ব্যাঙ্কে একাউন্ট খুলতে হবে তবেই ভাতা চালু থাকবে। এই কাজ করতে গিয়ে ব্যাঙ্কে নানাভাবে হয়রান হতে হচ্ছে ব্যাঙ্ক কর্মীদের দ্বারা। বিভিন্ন বাড়িতে দাসীবৃত্তি করা এই 'বিধবা'রা সময় করে ব্যাঙ্কে গিয়েও প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে— এই প্রচণ্ড রোদে অযথা ছোটাছুটি করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এই সব ক্ষেত্রে (বহু ক্ষেত্র আছে) এদের 'নতুন'দের, এইসব কাজে লাগানো হোক, এই কাজে নিষ্ঠা যাচাই করে তবেই পর্যায়ক্রমে এদের 'ঠাঁই' দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। এই প্রক্রিয়া সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটাতে পারে। উপযুক্ত নেটওয়ার্ক তৈরি হয়ে যাবে সামনের দুই বছরে। এই প্রস্তাব না উড়িয়ে দিয়ে একটু ভাবতে পারে বিজেপি নেতৃত্ব।

যে প্রস্তাবগুলি বিবেচনাযোগ্য হতে পারে তা হলো :

(১) শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে সমর্থ (যেমন শিক্ষক/শিক্ষিকা, বিভিন্ন বিভাগের কর্মী ইত্যাদি) দের 'স্বস্তিকা' নিতে হবে।

(২) 'সংগঠন' আছে বলে দাবি করাদের দিয়ে 'স্বস্তিকা'সহ জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকার 'স্টল' খোলানোর সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে।

(৩) বিজেপিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক পরিবারের কাউকে না কাউকে আরএসএস-এর প্রশিক্ষণে যোগ দিতেই হবে।

ঠিক এই মুহূর্তের উদ্বেগজনক খবর হলো বিজেপি বিরুদ্ধে সর্বাত্মক শত্রুতায় তৃণমূল ও সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের যৌথ উদ্যোগ হতে যাচ্ছে। একদিকে সরাসরি 'হার্মাদ' দিয়ে বিজেপি সমর্থকদের উপর অত্যাচার করা অন্যদিকে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বিজেপিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা— এই হচ্ছে লক্ষ্য। অত্যাচার তো চলছেই এককভাবে। এবার যৌথ ভাবে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল সৃষ্টি করে তার দায় বিজেপির উপর চাপানো আর একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক চক্রান্ত চলছে।

এবার মনে রাখতে হবে বিজেপি নেতৃত্বকে :

নবাগত এমপি/কর্মীদের নিয়ে উৎসবের যতই যুক্তি থাকুক না কেন 'উৎসব প্রবণতা' যেন তৃণমূল অনুসারী না হয়, অভিনয় জগতের সঙ্গে মাত্রারিক্ত সংযোগ-সহ।

যে সব উদ্বেগ ও আশঙ্কা থেকে এই লেখা বেরিয়ে আসছে তা মূল্যবান গুরুত্বহীন বলে না মনে করলেই এ লেখার সার্থকতা!

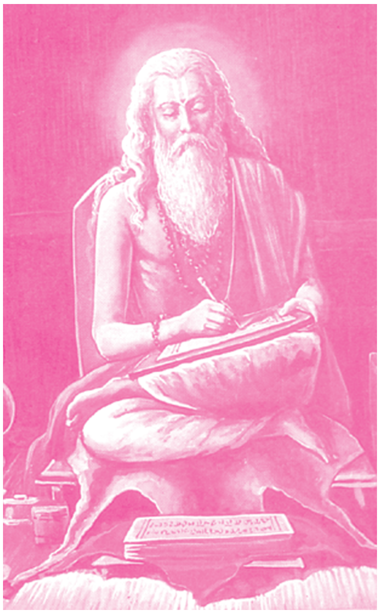

শ্রীগুরু পূর্ণিমা

বিদ্রোহী কুমার সরকার

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘‘যদি পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ থাকে, যাকে পুণ্যভূমি বলা যায় তবে নিশ্চিতভাবে সেই দেশ আমাদের মাতৃভূমি— এই ভারতবর্ষ।’’ এই পবিত্রভূমিতে ভগবান মৈত্রী ও করুণার বীজ বপন করে সকল সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই সংস্কৃতির ও সৃষ্টির ধারাকে রক্ষা ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে এসেছেন অগণিত আধ্যাত্মিক গুরু বা পথপ্রদর্শক আচার্য। তাঁরাই গুরুধর্ম রূপায়ণের মূলত রূপকার। আধ্যাত্মিক পৃথিবীর প্রবক্তা ও বৈদিক সভ্যতার প্রথম আচার্য মহর্ষি বেদব্যাস। তাঁর জন্মতিথিই ‘শ্রীগুরু পূর্ণিমা’ বা ‘ব্যাস পূর্ণিমা’। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিই সেই পুণ্যদিন। এই তিথিতে হিন্দুরা তাঁদের নিজ নিজ দীক্ষাগুরুর আরাধনার মাধ্যমে পরমগুরু বেদব্যাসের প্রতিই শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করেন। পরমগুরু বেদব্যাস লোকশিক্ষার জন্য কি করে গেছেন তা জানা হিন্দুমাত্রেরই আবশ্যক। লোকশিক্ষার কারণেই তিনি বেদকে বিভক্ত (ব্যাস) করেন। চতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন। সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্মের দার্শনিক ভিত্তির সুন্দর ব্যাখ্যা দেন। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র, বৃহৎসংহিতা, দত্তকদর্পণ, যোগসূত্রভাষ্য, বিশ্বনাথাষ্টক, শিবতত্ত্ব বিবেক, তীর্থ পরিভাষা প্রভৃতি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তাঁরই রচনা। গল্প ও উপাখ্যানের মাধ্যমে পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার প্রসার, সামবেদের প্রসার, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সৃষ্টি করে মহর্ষি ব্যাসদেব মানুষের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পূর্ণতা প্রাপ্তির বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। তাই এই ভারতীয় সংস্কৃতির গর্ব মহর্ষি ব্যাসদেব।

গুরুপূর্ণিমার দিন সারাদেশ ব্যাপী গুরুপূজনের আয়োজন চলে। সৃষ্টির ঊষাকাল থেকেই আমরা গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে শুনে আসছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস কর ‘কোঽহম্’— আমি কে? হয়ত উত্তর পাবে তুমি পিতা, পুত্র, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, বন্ধু ইত্যাদি। আরও গভীরে প্রবেশ করে গুরুচরণে তোমার আরও বেশি ভালবাসা, শ্রদ্ধা বাড়ালে উত্তর পাবে ‘শিষ্যোঽহম্’— আমি শিষ্য। সমস্ত রকম সম্পর্ক তখন এই সম্পর্কে বিলীন হয়ে যাবে। যিনি শিষ্য, তিনিই পারেন সাধক হতে, তাঁরই জীবন সম্ভাবনাময়, যে প্রকৃত শিষ্য তার সমস্ত কর্তব্যই তার গুরুর প্রতি সমর্পিত।’’ এখানে গুরু অর্থে অবশ্যই ‘সদ্গুরু’। শিষ্যের অনুরাগ ও প্রগাঢ় ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে গুরু তার আধ্যাত্মিক, লৌকিক ইচ্ছা পূরণ করেন। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর —এই গূঢ় তত্ত্বকে বুঝে উঠতে যে পারবে সেই ব্রহ্মত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে। গুরু ও শিষ্য আলাদা নয়। তাদের শরীরটাই আলাদা, কিন্তু অন্তর্চেতনায় তারা একাকার। গুরু-শিষ্যের অনন্যতা, একাত্মতা, তদাত্মাই পারে এই অনুভূতি জাগাতে। সত্যিকারের শিষ্য তার গুরুর নিজের স্বরূপ। শিষ্যের প্রাণে গুরুর তপঃশক্তি প্রবাহিত হয়। হৃদয়ে গুরুর ভাবনার উদ্রেক হয়। শিষ্যের অন্তরে গুরুর জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়। সদ্গুরুর কৃপায় শিষ্য দিব্যদৃষ্টি লাভ করে। সে ব্রহ্মকে দর্শন করতে পারে। সেই অপূর্ব দর্শনে সৃষ্টি, স্রষ্টা, দর্শন একাকার হয়ে যায়। শিষ্য, সদ্গুরু, ব্রহ্মত্বের ব্যবধান নিজে নিজেই কমে যায়। তাই ‘গুরু কৃপাহি কেবলম্’। গুরুর কৃপা না পেলে কি হবে? ভগবান মহাকাল বলেছেন— বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, মন্ত্র, তন্ত্র, সমস্ত রকম বিদ্যা তোমার মস্তিষ্কে বোঝা সৃষ্টি করবে। মানসিক বোঝা যত বাড়বে তত ভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়বে। মূল্যবান বিদ্যাও অর্থহীন হয়ে পড়বে। গুরুকৃপা থাকলে ওই কালো কালো অক্ষরগুলো আলোকিত দীপ হয়ে উঠবে। শিষ্যের অশুদ্ধ মনের অন্ধকার চেতনার আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারেন সদ্গুরু। যদিও বলা হয় তোমার প্রবুদ্ধ আত্মাই সদ্গুরু।’’ ঠাকুরের কথায় ‘সচ্চিদানন্দই গুরু’। কিন্তু এই স্থিতিতে পৌঁছোনোর জন্য পথপ্রদর্শক গুরু অবশ্যই দরকার। পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা, অধ্যবসায়, ব্যাকুলতা এই গুণগুলো নিয়ে শিষ্যকে গুরুর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে। ক্ষমা, দান, সন্তোষ, সত্য প্রভৃতি গুণকে অমৃত সমান মনে করে তার অনুশীলন করতে হবে।

গুরু-শিষ্যের গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা করলে যা বেরিয়ে আসে তা সবই লোক কল্যাণের জন্য, সমাজ সংস্কৃতি রক্ষার জন্য, দেশ ধর্মকে রক্ষার জন্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কাজের মাধ্যমে সেই চেষ্টাই করে চলেছে। সঙ্ঘ তত্ত্বনিষ্ঠার উপর জোর দিয়ে রাষ্ট্রপ্রতীক গৈরিক ধ্বজকে গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। রাষ্ট্রপ্রতীক হিসাবে গৈরিক পতাকাকে স্বীকার করে নিয়েছিল ‘ফ্ল্যাগ কমিটি’।

নানা আলোচনার পর তাঁরা ঐক্যমতে পৌঁছলেন যে ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকা একটি মাত্র রঙের হবে এবং তা হবে গেরুয়া রঙের; তাতে ধ্বজদণ্ডের পাশে থাকবে চক্রের ছবি। কমিটি লিখেছে—

গেরুয়া রং ভারতীয় পতাকার নির্দেশক। কেবলমাত্র গেরুয়া রং-ই ভারতীয় জনজীবনের ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এর একটি নিজস্ব আবেদন রয়েছে এবং তা ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুকূল (রিপোর্ট অফ দি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ কমিটি, ১৯৩১)। কমিটি তো সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল কিন্তু সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ারের অনুমান সত্য হলো। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ফ্ল্যাগ কমিটির প্রতিবেদন নস্যাৎ করে দেওয়া হলো। আর তা হলো আপোসের রাজনীতির জন্য। গেরুয়া রং যে রাষ্ট্রের প্রতীক তা একবাক্যে সমস্ত বিদগ্ধ ব্যক্তিরা মনে করেন। সেই গৈরিক ধ্বজকেই গুরুর আসনে বসিয়ে সঙ্ঘ তার দৈনন্দিন শাখার মাধ্যমে গুরুর আরাধনা করে চলেছে। স্বয়ংসেবকরা যদি গুরু গৈরিকের শিষ্য হোন তবে তাঁদের তো সাধক হতে হবে। সমস্ত কিছু গুরুর পায়ে সমর্পণ করে তাঁর কৃপালাভ আমাদের করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রভক্ত নাগরিকে পরিণত হতে হবে, আমরা যে সামাজিক ঋণে আবদ্ধ এই কথা সব সময়ের জন্য মনে রাখতে হবে। সমাজ কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে সেই ঋণ তো আমাদের শোধ করতে হবে। সেই ঋণ শোধ করার সামর্থ্য গুরু গৈরিক আমাদের প্রদান করেন। তাই তো এই সাধনা। নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয় সমস্ত রকম ভালো গুণাবলী দিয়ে— এখানেই তো শিষ্যের নিদর্শন।

গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সমর্পণের প্রতীক হিসাবে গুরুদক্ষিণা— এ এক প্রাচীন পরম্পরা। আমরাও বছরে এই একটি দিনে ধন সমর্পণের মাধ্যমে গুরুদক্ষিণা সমর্পণ করে থাকি। এর মাধ্যমে বিচার হয় আমরা কতটা গুরুর কাছাকাছি আসতে পেরেছি। কতটা সমর্পণ করব— তার জন্যও চিন্তন-মনন দরকার। 'আমি পরিবারের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করব' একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, একথা উচ্চারণ না করেও ব্যক্তি পরিবারের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করে, এমনকী মৃত্যুকেও স্বীকার করতে সে পিছপা হয় না। তাহলে এই সর্বস্ব অর্পণের ভাব সমাজের জন্য কেন থাকবে না? গুরু গৈরিক তো তাই চাইছেন— সমাজের জন্য সর্বস্ব অর্পণ।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার বলতেন, ''সামাজিক কার্যে' যথাশক্তি বলা ঠিক নয়। পরিবারের ক্ষেত্রে কি তা বলি?'' সমাজের ব্যাপারেও এই চিন্তা দরকার, এই মানসিকতা প্রয়োজন। অবসর সময়ে সমাজের কাজ করার মধ্যে কৃত্রিমতা আছে, অজ্ঞানতা আছে। এর মধ্যে না আছে ব্যক্তির কল্যাণ না সমাজের কল্যাণ। সততা, নিঃস্বার্থ ভাবনা নিয়ে, সর্বস্ব অর্পণের মনোভাব নিয়ে কাজ করার মধ্যেই আছে স্বাভাবিকতা। নিঃস্বার্থবুদ্ধিতে রাষ্ট্রদেবতার পূজাই সত্যিকারের গুরুপূজা। এতেই রাষ্ট্রের কল্যাণ নিহিত। ■

(শ্রীগুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রকাশিত)

নেত্রদান মহাদান

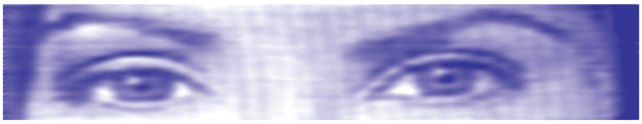

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

গুরু-পরম্পরার নানান দিক

রবীন সেনগুপ্ত

গুরু মুখ্যত চার প্রকারের হয়ে থাকেন। যথা মাতৃগুরু, পিতৃগুরু, শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। এই চার প্রকার গুরুর মধ্যে কোন গুরু সবচেয়ে বড় এই নিয়ে প্রায়শই বিতর্ক বেঁধে যায়। বেদের অন্তর্গত মীমাংসা শাস্ত্র অনুযায়ী এই চার প্রকার গুরুই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বড় ও মহান। যেমন মাতৃগুরু গর্ভধারণের কষ্ট সহ্য করেন, ছোট অবোধ শিশুটিকে দিনের পর দিন নানা বিরক্তিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি বড় করে তোলেন। এই জায়গাটাতে মায়ের সমপর্যায়ে অপর কোনো গুরু কোনো ভাবেই আসতে পারেন না। তাই শাস্ত্রে বর্ণনা আছে— 'পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণাৎ। অতৌ হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসম গুরু।।' আবার জন্মের বীজ প্রদাতা তো পিতৃগুরুই। মা ও শিশুর অন্ন বস্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতারাই করে থাকেন। বড় হলে তাকে শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করার বিপুল অর্থও তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতারাই কষ্ট করে জোগাড় করেন। বিবাহের খরচটাও অধিকাংশই পিতা কষ্ট করেই বহন করে থাকেন। এই জায়গাটিতে পিতার পর্যায়ে আসতে পারেন না অপর কোনো গুরুই। তাই বেদে বলা হয়েছে— 'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমং তপঃ'। মা-বাবা গুরু হিসাবে থাকার পরও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সন্তান দেশদ্রোহী, কুলদ্রোহী, মূর্খ, ধাপ্পাবাজ ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য কি কষ্টটাই না পাচ্ছে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষাগুরুরাই সন্তানকে সঠিক পথের দিশা প্রদর্শন করতে পারেন। তাই শিক্ষাগুরুও তাঁর নিজ ক্ষেত্রে মহান। শিক্ষাগুরু আবার দুই প্রকারের হন। যথা আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু ও জাগতিক শিক্ষাগুরু— দুজনেই শিক্ষাদান করে থাকেন। আর আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুরা মানুষকে বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি মহান শাস্ত্রগ্রন্থের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, ন্যায়নীতি, আত্মা, পরমাত্মা, প্রার্থনার গুরুত্ব, দান-ধ্যান-সেবা-সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। মা-বাবা ও জাগতিক শিক্ষাগুরুরাও কখনও কখনও এইসব বিষয়ে শিক্ষা দেন, তবে বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুরা এই ব্যাপারে সবাইকে ছাপিয়ে যান। শিক্ষাগুরু হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা কি সাধারণ মা বাবা ও জাগতিক শিক্ষাগুরুরা পারতেন? তাই বিশিষ্ট শিক্ষাগুরুদের ছবি ঘরে ঘরে পূজিত হয়ে আসছে যুগযুগান্ত ধরে। এই স্থানটিতে মাতৃগুরু পিতৃগুরুরাও আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুর কাছে ম্লান হয়ে যান।

আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু ছাড়া মানুষ অন্ধই থেকে যায়। আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুদের কাছে শিক্ষা নিয়েই কেউ কেউ দীক্ষাগুরুদের শরণাপন্ন হন। মানুষ যতই লেখাপড়া শিখুক, যতই মাতৃপিতৃ ও দেশভক্ত হোন না কেন জীবনের বিশেষ সময়ে এসে তাকে দীক্ষাগুরুর শরণাপন্ন হতেই হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপমন্যু ঋষিকে তাঁর দীক্ষাগুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বিবেকানন্দ দীক্ষা নেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে, গোলওয়ালকরজীর দীক্ষা স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে; ছত্রপতি শিবাজীও রামদাস স্বামীকে নির্বাচিত করেছিলেন দীক্ষাগুরু হিসাবে। দীক্ষাগুরুর প্রদত্ত মন্ত্রও সময়ে সময়ে দারুণ কার্যকর হয়ে ওঠে। দীক্ষাগুরুও তাঁর নিজের জায়গায় শ্রেষ্ঠ গুরু হিসাবেই বিবেচিত হন। অর্থাৎ চার প্রকার গুরুই যে যাঁর নিজের জায়গায় মহৎ। ছোট কাউকেই করার উপায় নেই। তবে এই চার প্রকার গুরুর মধ্যে সবাই আবার ভালো হন না। সব গুরুর মধ্যেই সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, দৈবিক, আসুরিক ইত্যাদি ভাগ থাকে। গুরুরা যদি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও দৈবিক ভাবাপন্ন হয় তাহলে চিন্তা নেই। কিন্তু তাঁরা যদি ঘোর তামসিক আর আসুরিক ভাবাপন্ন হন তখনই হয়ে ওঠে মুশকিল। কারণ তামসিক আর আসুরিক গুরুরা মানুষকে শুধু টাকা, গাড়ি, বাড়ি, যৌনতা, দেবদেবীর নিন্দা, মন্দির ভাঙা, গো-হত্যা করা, অনুপ্রবেশের মাধ্যমে দেশ দখল করা, জেহাদের মাধ্যমে খুন লুণ্ঠন ইত্যাদি কু-শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। শাস্ত্রে বলা আছে যে কলিযুগে এমনই বাজে গুরুতে পৃথিবীটা ভরে যাবে। আর হচ্ছেও তাই। তবে এরকম আসুরিক গুরুরা আগেও ছিলেন। শুক্রাচার্য তো অসুরদের গুরু, তিনি তো বহু পূর্বযুগেরই গুরু। শংকরাচার্যর আমলেও বহু কাপালিক ও অন্যান্য বাজে গুরুর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। তবু আমাদের কর্তব্য হলো সংখ্যায় কম থাকলেও সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করে জীবনের পথ চলা। ■

সাধুর কুকুর

পুনর্কথন : কৌশিক গুহ

দুদিন টানা বৃষ্টিতে চারপাশ জলে থই থই। সাধু মহারাজ দেখলেন একটা কুকুরছানা জলের টানে ভেসে যাচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটু সাঁতার কেটে কুকুরছানাটাকে তুলে নিয়ে এলেন। সে তখন কাঁপছে। সাধু মহারাজ ঘরে গিয়ে তাকে শুকনো কাপড় দিয়ে মোছালেন। একটা কাপড় ঢেকে শুইয়ে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক বড় বাটিতে দুধ গরম করে খাওয়ালেন ফুটফুটে কুকুরছানাটাকে। সে আনন্দে খুশিতে সাধু মহারাজকে অন্যভাবে দেখল। সে জানত না তার জীবন তো শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এই মানুষটি জল থেকে তুলে এনে তাকে রক্ষা করেছে। দুর্বল পায়ে সে একটু ঘুরে আবার শুয়ে পড়ল। সাধু বললেন, 'শুয়ে থাক। একটু বাদে আবার দুধ খাওয়াবো।' কথা শুনল কুকুরছানা। সাধু তার নাম দিলেন মংকু। দিনে দিনে বড়ো হতে লাগল! সাধু বলে দিয়েছেন, 'আশপাশে জঙ্গল। দূরে কোথাও যাবি না।' মংকু লাফায় ঝাঁপায় খেলে। সাধুর দেখতে ভালোই লাগে। তাঁর কাজে কোনো অসুবিধে হয় না। রান্না করে দিলে খায়। সাধু নিরামিষ খান। তবে মংকুর জন্যে মাছ রান্না করে দেন। তার খাবার জন্যে বাটি রয়েছে। তা রোজ পরিষ্কার করেন। মংকুর বিছানা নিজের শোবার জায়গার পাশেই। কেমন এক মায়ার বন্ধন সাধুর মনে। নিজেকে বলেন, 'এও তো কর্তব্য।' সারাদিন পড়াশোনা ধ্যান পুজোয় কাটে। মংকু এদিক ওদিক ঘোরে। তাকে ডাকলেই সাড়া দেয়। চলে আসে ছুটতে ছুটতে।

সেদিন মংকু একটু দূরে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখে একটা বড় জন্তু তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। মংকু রেগে গিয়ে চিৎকার করল। সে বুঝল জন্তুটা নেকড়ে বাঘ। ভাবল ওই জন্তুটার থেকে সে যদি বড় জন্তু হত তাহলে ভয় থাকত না। মংকু বিপদে পড়েছে আর তার মনের অবস্থাটা সাধু দূর থেকে বুঝতে পারলেন। তিনি কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে মন্ত্র পড়তেই মংকু বাঘ হয়ে গেল। সে ফিরে এলো আশ্রমে। সাধু বললেন, 'তোকে এবার খাবার জোগাড় করতে হবে। দুধ মাছে তো হবে না।' তাই হতে লাগল। সাধু একটা জায়গা করে দিলেন মংকুর থাকার জন্যে।

কদিন বাদে বনে ঘুরতে ঘুরতে আবার বিপদের মুখোমুখি হলো মংকু। একটা বড় বাঘ সামনে হাজির। মংকু বুঝতে পারল নিস্তার নেই। ভাবল যদি সে সিংহ হত তাহলে বাঘটা ভয় পেয়ে পালাত। সাধু বুঝতে পারলেন মংকুর ভাবনা। মন্ত্র পড়ে তাকে সিংহ করে দিলেন। মংকু সিংহ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে একদিন তার মনে হলো, খাবারের জন্যে এদিক ওদিক ঘোরার কি দরকার! নাগালের মধ্যেই তো সাধু রয়েছে। তাকে খাওয়া যেতে পারে। এক থাবা মারলেই মরে যাবে।

সে ভাবতেই পারেনি সাধু তার সব পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাবেন। মংকু যখন সাধুকে খাবার মতলব নিয়ে এগোচ্ছে তখন সাধু হেসে বললেন, 'তুই এইরকম হলি! যাক আগের মতোই হয়ে যা।' বলার সঙ্গে সঙ্গে মংকুর চেহারা বদলে গেল। সে সিংহ থেকে আবার হয়ে গেল কুকুরছানা। বুঝতে পারল মস্তবড় অপরাধ করে ফেলেছে। তাকে একদিন যিনি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন তাঁর ক্ষতি করতে যাচ্ছিল! যিনি তাকে বার বার বিপদের সময় রক্ষা করেছিলেন তাঁকে সে মারতে যাচ্ছিল! অনুতাপে সে সাধুর পায়ের নিচে গড়াগড়ি দিল। সাধু বললেন, 'এবার নিজেকে রক্ষা করবি নিজে। আমার মায়ার বন্ধন আর নেই। এখানে খাবি থাকবি। তবে আবার কোনো বিপদ এলে আমি রক্ষা করতে পারবো না। সেই বুঝে চলবি।'

মংকু অপরাধ স্বীকার করে সাধুর পায়ের নিচে গড়াগড়ি খেয়ে বলতে চাইল, 'তাই হবে। তাই হবে প্রভু।'

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

দেবজ্যোতি আর ছোটোদের বই

‘যে কাজ করবে তাতে পুরো মনোযোগ থাকা চাই। আর সেজন্যে পরিশ্রম দরকার। এই পরামর্শ বিশিষ্টজনদের। সব ক্ষেত্রেই মানা জরুরি। লেখক চিত্রকর প্রকাশক এবং পাঠকরা এ ব্যাপারে মনোযোগী হলে উন্নত হবে গ্রন্থরুচি ও প্রকাশমান।’ কথাগুলো লেখা রয়েছে দেবজ্যোতির ঘরে। বেশ বড় ঘর। ঘরের একদিকে টানা আলমারি, বইয়ের তাক। অনেক বই যত্নে রাখা। যখন যেটা দরকার সেটা একেবারে হাতের নাগালে। টেবিল বড়। তাতে কোনো বাড়তি জিনিস নেই। চটপট কাজ করা দেবজ্যোতির অভ্যেস। ছোটোদের আর বড়োদের নানারকম বই প্রকাশ করে তারা। বাবা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। এখন দেবজ্যোতির উপর দায়িত্ব। বই ভালোভাবে তৈরি করলে তা পাঠকদের কাছে মর্যাদা পায়। পাঠককে সম্মান জানিয়েই সমস্ত কাজ। কোনোটাই হেলাফেলার নয়। ছোটোদের বই তৈরির সময় অনেকগুলো ভাবনা মাথায় থাকে। কাদের জন্যে বই? বয়েস কত তাদের? বইয়ের বিষয়টা কি? কীভাবে বলা হবে? লেখার সঙ্গে কীরকম ছবি থাকবে? কোন্ পদ্ধতিতে ছাপা হবে? বইয়ের আকার হবে কি মাপের? কত পৃষ্ঠার? কেমন কাগজ? বাঁধাই কেমন হবে? এত ভাবনা ঠিকই, তবে সেজন্যে বেশি সময় লাগালে চলে না। চটপট সব ঠিক করে ফেলতে হয়। কাজ এগোতে থাকে পরিকল্পনামাফিক। ছোটোদের বই তৈরির সময় নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। নতুন বই হাতে পাওয়ার আনন্দ ছিল অন্যরকম। বইয়ের গন্ধটাই মন ভরিয়ে দিত। এক একটা ছোটোদের বই তৈরি করে আনন্দ পায় দেবজ্যোতি।

বইমেলার মাঠে তাদের কোম্পানির স্টলে ছোটোরা যখন আসে তখন মনে হয় চারপাশ ঝলমল করছে। নতুন নতুন বই দেখে খুশি হয় তারা। যে কোনো বই হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ থাকে। কেউ বারণ করে না। অনেকের বাবা-মা উৎসাহ দেন। বলেন, ‘তোমার পছন্দের বই নাও।’ ছোটোদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে স্টলের লোকজন। ওইরকমই নির্দেশ দেবজ্যোতির। চার থেকে পনেরো বছরের পাঠকদের কাছে বই যত্নে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা থাকে। বই হাতে নেওয়ার পরে ছোটোদের মুখ যখন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা দেখে আনন্দ পায় দেবজ্যোতি। আবার কোনো কোনো বাবা মা বলেন, ‘বই দেখতে পারো, কেনা যাবে না। বইয়ের বদলে মজা করে খাওয়া যাবে।’ তার মধ্যে কারও কারও জেদ থাকে বই কেনার। দেবজ্যোতি উৎসাহ দেয় তাদের। কারণ সে জানে আজ যারা আগ্রহ নিয়ে দেখছে তাদের মনটাকে বইয়ের টানে মাতিয়ে রাখতে পারলে তারা বইকে ভালোবাসবে। পড়ার অভ্যেস তৈরি হয়ে যাবে। আগামীদিনের পাঠকরা রয়েছে ছোটোদের মধ্যে— এটা দেবজ্যোতি সবসময় বিশ্বাস করে। মেলার মাঠে এমন অনেক ছেলেমেয়ে আসে যাদের দেখে বোঝা যায় বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। ওই ধরনের ছেলেমেয়েকে যে কোনো একটা বই বেছে নিতে বলে দেবজ্যোতি। সেই বইটা প্যাকেটে ভরে উপহার দেওয়া হয়। সেই সময় ছেলেটি কিংবা মেয়েটির মুখ আনন্দে ভরে ওঠে। দেবজ্যোতির তখন মনে হয়, একটা ভালো কাজ হলো।

বইমিত্র

বই-চিত্র-কথা

পূর্বাঞ্চলের নারীকথা

সালমা খাতুন

মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মায়ের স্থান সবচেয়ে উপরে থাকে। সেখানে বাবা-সহ সমস্ত পুরুষ সদস্যকে মায়ের আদেশ মেনে চলতে হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মেঘালয়ের গারো ও খাসি সমাজে আজও মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। দক্ষিণ ভারতের কেরলেও কোনো কোনো সমাজের মধ্যে এই পদ্ধতি কমবেশি দেখা যায়। তাছাড়া বনবাসী সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় এই পদ্ধতিতেই তাদের পরিবার চলে। মেঘালয়ের খাসি পরিবারের মেয়েরা কোনো ছেলেকে বিয়ে করলে বিয়ের পর বরকে নিজের মা-বাবা, ঘরবাড়ি, ভাই-বোন সবকিছু ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি চলে আসতে হয়। স্ত্রীর মা-ই এই পরিবারের কর্ত্রী থাকেন। এঁদের পদ্ধতি অনুসারে শ্বাশুড়ীর

মৃত্যুর পর পরিবারের সবচেয়ে ছোট মেয়ে যাঁর বিয়ে হয়েছে তিনি কর্ত্রী হন। মা-বাবার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছোট মেয়ে ও জামাইয়ের ওপরই থাকে। এর কারণ মনে করা হয় ছোট মেয়ে বেশিদিন মা-বাবাকে দেখাশুনা করতে পারবে।

বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসা পুরুষকে অর্থাৎ জামাইকে শ্বশুরবাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করতে হয়। জামাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পুরোশক্তি লাগিয়ে সংসারের উন্নতি করা। তার প্রথম কাজ হয় রান্নাবান্নার জন্য কাঠ জোগাড় করে এনে তা কুড়ুল দিয়ে ভালভাবে কেটে রাখা। মেয়েরা কাটা কাঠ বাড়িতে নিয়ে আসে। সমগ্র পূর্বাঞ্চলে 'ঝুম' চাষ হয়। প্রথমে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করে ১/২ বছর চাষ করা ও উর্বরতা কমে গেলে অন্য কোনো স্থানে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করে চাষ শুরু করা— সবই খুব দায়িত্বের সঙ্গে জামাইকেই করতে হয়। বেচারির তো এর থেকে রেহাই নেই! পদ্ধতি অনুসারে নিজের ঘরেও ফিরতে পারে না। কাঠ কাটা ও ঝুমচাষ ছাড়া পুরুষদের জীবন খুবই আনন্দপূর্ণ হয়। যে পরিবারে নিজের চাষের জমি নেই বা বেশি কাঠ কাটার প্রয়োজন পড়ে না, সেখানে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনে স্ত্রীকে সহায়তা করা ও বাকি সময় ধূমপান ও নেশা করে অলসভাবে জীবনযাপন করে পড়ে থাকা।

পূর্বাঞ্চলের শহর-গ্রামে মহিলাদের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যাবে। সমস্ত স্থানে পান-সুপুরি-তামাকের দোকানে মহিলাদেরই ভিড় লেগে থাকে। দোকানিও মহিলারাই। পুরুষ-মহিলা সবাই পান-সুপুরির ভক্ত। মুখভর্তি পান আর যে-কোনো জায়গায় পিক ফেলতে এরা অভ্যস্ত। হাটে-বাজারে শাক-সবজির দোকান থেকে বড় দোকান সব জায়গায় মালিক মহিলারাই। এদের সমাজে কিছু বিক্রি করা বা দোকানদারি করা মহিলাদের পক্ষে খুবই সম্মানের ব্যাপার।

বর্তমান যুগে সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের টিটকিরি করে, কখনো কখনো অশালীন ব্যবহারও করে ফেলে। কিন্তু মেঘালয়ের খাসি ও গারো সমাজে এর উলটোটাই হয়। এখানে মেয়েরাই ছেলেদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে। পরিবারে মা তাঁর ছেলেকে পাড়ার বা বে-পাড়ার মেয়েদের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। মায়ের পরামর্শ এরকম হয়— 'মেয়েরা পিছু নেবে। অন্ধকার হওয়ার আগেই বাড়িতে ফিরে আসবে'। বাবাও তার পুত্রের মঙ্গলের জন্য এরূপ উপদেশ দিয়ে থাকে। দুপুরে কোনো খাসি মহল্লায় দেখা যাবে— সমস্ত কাজকর্ম মেয়েরাই করছে। পুরুষদের দেখাই যাবে না। রাস্তায়, দোকানে শুধু মেয়েদেরই দেখা যাবে। সে বয়স্কা, যুবতী ও ছোট মেয়েই হোক না কেন। পুরুষরা তখন বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকে নয়তো নেশা করে বাড়িতেই পড়ে থাকে।

মেয়েরা সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকছে— এই চিত্র শুধু পূর্বাঞ্চলেই নয় সারা ভারতেই দেখা যায়। কিন্তু খাসি ও গারো সমাজের রীতিই হলো মহিলারা এখানে সবকিছু নিজের অধিকারেই করেন। তাঁরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পুরুষের এখানে কথা বলার অধিকারই নেই। পুরুষরা কী করবে ও কী করবে না তা মহিলারাই ঠিক করে দেন। কোনো পুরুষের যদি তা ভালো না লাগে তাকে এক কাপড়েই বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অধিকার থাকে তার স্ত্রীর।

আজকাল খাসি ও গারো সমাজের যুবক যাঁরা কলকাতা- মুম্বাই-পুনে অথবা দিল্লী-চেন্নাইয়ে পড়াশুনা করে উচ্চশিক্ষিত হয়ে ফিরছেন এরকম যুবকদের মনে প্রশ্ন উঠছে— তারা কি মেয়েদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে? কলকাতায় পড়তে আসা এরকম কিছু যুবক এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। এক শ্রেণীর কথায় তাঁদের সমাজে মেয়েদের স্থান অনেক উচ্চে।

প্রাচীন ভারতেও মেয়েদের স্থান তো উচ্চেই ছিল। কলকাতায় পড়তে আসা এক খাসি যুবকের কথায়— "আমাদের সমাজে কোনো নারী নিগ্রহ হয় না।" বস্তুত গারো ও খাসি সমাজের নারী শুধু মা নন, পরিবারের কর্ত্রী নন, তাঁর স্থান অনেক ওপরে। ■

অতিথি কলম

কানোয়াল সিবাল

মোদীর সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বার্তাগুলি বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ কীভাবে নিচ্ছে

দিল্লীর ক্ষমতার অলিন্দে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে— নির্বাচনে বিপুল জয়ের পরেই কিছুটা তড়িঘড়িই প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রধানদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির করিয়ে মোদী কি খানিকটা আগ্রাসী ভূমিকা প্রদর্শন করলেন না, এটা আদতে আত্মরক্ষারই কৌশল?

প্রসঙ্গত কাছে-পিঠের প্রতিবেশীদের সঙ্গেই বেশ দূরের মরিশাসকেও আমন্ত্রণ করে একদিকে তিনি যেমন প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষায় গুরুত্ব দিলেন তেমন মরিশাসের মতো ছোট দেশ অথচ যেখানে বিরাট সংখ্যক জন্মসূত্রে ভারতীয়ের বাস, তাদেরও হৃদ্যতা সূত্রে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন। ভারত সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে স্বাভাবিক অধিকারে নেতৃত্ব দেওয়ার ইঙ্গিতও এই বার্তায় পাওয়া যায়। অবশ্যই এই ধরনের ভাবনা চিন্তা মোদীর কুশলী ও অনুপ্রাণিত করার মতো নেতৃত্বের সঙ্গে মানানসই।

বিষয়টা আরও একটা দিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। গত ১২ বছর ধরে লাগাতার তাঁকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী 'সাম্প্রদায়িক', মেরুকরণের রাজনীতিক হিসেবে দেশের তথাকথিত 'সেকুলার' মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীরা প্রচার করে এসেছে। এই অপপ্রচার অন্য দেশগুলির এক গরিষ্ঠাংশ সমমনস্ক মানুষ বিশ্বাস করেছে। ভাবমূর্তির এই অনর্থক নেতিবাচক প্রভাবকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুনরুদ্ধার করতে তিনি যে-কোনো বিশেষ দর্শনের অনুসারী নন তা হাতনাতে প্রমাণ করতেই সকলকে এক সঙ্গে নিয়ে চলার এই সদর্থক ইঙ্গিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক বার্তা বিদেশীরা কীভাবে গ্রহণ করবে? মোদী সম্বন্ধে বরাবরের সন্দিহান কিছু ব্যক্তি বোঝাচ্ছেন এই কৌশলে মোদী এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন। প্রথমত, আন্তর্জাতিক মতামতকে এমন একটা অভাবিত বার্তার মধ্যে দিয়ে স্বপক্ষে টেনে আনা ও তারপর জমি তৈরি হয়ে গেলেই 'ভারত প্রথম' এই প্রাথমিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

অন্যদিকে যাঁদের মন এমন চির-সন্দিহান নয় তাঁরা বলছেন এটা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব গ্রহণ করার অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া। তাঁদের কথায় ভোটের ময়দানে মোদী হয়তো কখনো-সখনো বিভেদমূলক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিত্রিত হয়ে থাকতেও পারেন, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর তাঁকে সকলকে নিয়ে চলতে সক্ষম এমন এক ছবি প্রমাণ করতেই হবে। বিশেষ করে তাঁর 'সকলের জন্য উন্নয়নের' প্রতিশ্রুতি তো দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে অশান্তি, অস্থিরতা তৈরি হলে সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়বে। শুরু শুরুতেই তাঁর এই প্রচেষ্টা যে দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এক মাইল ফলকই শুধু নয়, তাঁকে একজন দৃঢ়চেতা, দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিদ্ধহস্ত এবং যে-কোনো রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ এক প্রশাসক হিসেবে তুলে ধরবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভেঙে যাবে অনেক মিথ্যার অতিকথন।

মোদী যদি নিশ্চিতভাবেই স্থির করে থাকেন যে অর্থনীতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে আর সেই সূত্রে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ালে তা হবে সামগ্রিক বৃদ্ধির সহায়ক। সেক্ষেত্রে সফল হতে তিনি পারস্পরিক সমঝোতার (concilia-tory policy) নীতি নেবেন। এখানে প্রশ্ন ওঠে এই পথে তিনি কতদূর যেতে পারবেন। যদি অন্য পক্ষরা মনে করে থাকে সমঝোতা নীতির সুযোগে তাদের চাহিদাগুলোই শুধু পূরণ করে নেবে কিন্তু ভারতের প্রয়োজনগুলির ক্ষেত্রে সাড়া দেবে না সে ক্ষেত্রে সমঝোতার সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে পড়বে। এই সূত্রেই প্রশ্ন আসে আমাদের নিজে থেকে এগিয়ে হাত বাড়ানোর ফলে তারা কি এমনটা ভাবতে পারে— ভারত আমাদের বেশ সমীহ করে চলছে? তাই এই মওকায় নিজেদের কেনা-বেচাটা গুছিয়ে নাও। অথচ পক্ষান্তরে একটি যথেষ্ট শক্তিধর জাতীয়তাবাদী সরকারই দিল্লীর ক্ষমতায় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত।

চীনের উদাহরণ :

অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চীন কর্তৃপক্ষ মোদী সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে। তাতে কিন্তু সীমান্ত সমস্যার কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মোদী সরকারকে অভিনন্দন জানানোর প্রথম সুযোগ পেলেও অরুণাচল প্রদেশবাসীদের চীন যাত্রার ক্ষেত্রে staple visas বিষয়টির ওপর ভারতের প্রতিবাদের অংশটিকে হেলায় এড়িয়ে তাঁরা বললেন— অরুণাচলবাসীর ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রমী বন্দোবস্ত। এতে দু' দেশের বৃহত্তর সীমান্ত অঞ্চলে বিতর্কিত অবস্থানের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, চীনের নীতি হচ্ছে সীমান্ত এলাকা ঘেঁষে ভারতের কোনো নজরদারি তারা বরদাস্ত করবে না। পক্ষান্তরে তাদের সীমান্ত সংরক্ষিত রাখতে সীমান্তের যে বিপুল বিবাদিত অঞ্চল রয়েছে সেগুলি সবরকম পুনর্বিবেচনার ঊর্ধ্বে। মোদ্দা কথা, যা কিছু দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হবে তার ওপর সীমান্ত সমস্যার ছায়া অতি সামান্যই পড়বে বা না পড়াই ভাল। অর্থাৎ মূল সমস্যা থেকে বিশ যোজন দূর।

উল্লেখ করা জরুরি যে চীনের এই একপেশে অবস্থান কোনোভাবেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে আমাদের সদর্থক পদক্ষেপের সঙ্গে খাপ খায় না। অন্যদিকে পাকিস্তানকে পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি প্রদান করে শক্তিশালী বানিয়ে ভারতের উপর নিরন্তর চাপ বাড়ানোর সব প্রক্রিয়াই চীন দীর্ঘদিন ধরে জারি রেখেছে। এটা সকলেরই জানা--- চীনের নীতিগত অবস্থান ও ক্রিয়াকলাপ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির ক্ষেত্রে সর্বদাই তাদের ভারত-বিরোধী হতে

সাহায্য করে। প্রসঙ্গত চীনই পাকিস্তান ছাড়া আর একমাত্র দেশ যারা আমাদের ভূখণ্ড দীর্ঘকাল বেদখল করে আছে।

বাস্তবে আমরা আরও যে বিষয়টার জন্য চীনের ব্যাপারে আগ্রহী তা হলো ব্যবসা। কিন্তু এখানেও তাদের কাছ থেকে বলার মতো কোনো সুবিধে এ যাবৎ পাইনি। চীন তাদের বাজারে আমাদের পণ্যকে বিশেষ ঢুকতে দেয় না। অথচ আমাদের গণেশমূর্তি পর্যন্ত চীনে দেদার তৈরি হয়ে আমাদেরই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। এমন উদাহরণ শিশুও জানে। গত বছরে বৈদেশিক বাণিজ্যে চীনের সঙ্গে ঘাটতি ৩১ বিলিয়ন ডলার। এটা দীর্ঘকালীন চলতে পারে না। তাই নতুন রাস্তায় গিয়ে ভারত শিল্প, পার্ক ও পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে চীনের কাছে বিনিয়োগ করার প্রস্তাব রেখেছে। এখানেও দেশকে হতাশ করে ওয়াং ই বলেছেন, এগুলি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার অঙ্গ। আরও বেশি মাত্রায় বিশেষ সুবিধা ও চীনা উদ্যোগপতিদের অনুকূলে ঢেলে অগ্রাধিকার দিলে ভাবা যেতে পারে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে কিছুই হবে না। এখানে অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ চৈনিক পরিকল্পনা মাথায় রাখলে 'ওয়াং ই' ভারত ও চীন যে ব্যবসা ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অংশীদার হওয়ার ধুয়ো তুলেছে তা একেবারেই খেলো প্রতীয়মান হবে। তবুও যদি ধরেও নেওয়া যায় ভবিষ্যতে সত্যিই কোনো মজবুত অর্থনৈতিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে উঠল তবুও কিন্তু সীমান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে তা কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনার রক্ষাকবচ হবে না। প্রমাণ, চীন প্রতিবেশী জাপানের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা ও অর্থনৈতিক লেনদেন দৃঢ় করা সত্ত্বেও একইভাবে জিইয়ে রেখেছে।

আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক :

মনে হতে পারে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করা মানেই তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক কেমন বা তালিবানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তারা কতটা লুকোছাপা করছে বা আলোচনায় কোন পক্ষ বেশি ভারত-বিরোধী ধারণা পোষণ করে এসবই খুঁজে বেড়ানো। কিংবা আমেরিকার সংশোধিত অভিবাসন (immigration) নীতি কেমন, H1B বা L1 ভিসা দেওয়ার অর্থমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিযোগিতার বাজারে আমাদের আই টি শিল্পের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে কিনা, আমাদের সামগ্রিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, লগ্নী ও সেই সংক্রান্ত নীতিসমূহ বা 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটের' ওপর হস্তক্ষেপ করে আমেরিকার নির্দিষ্ট কিছু কর্পোরেট সংস্থার সুবিধে করে দেওয়া হচ্ছে কিনা এর কোনোটাই তেমন বিশাল গুরুত্বের নয়। যেমন নয় সেখানে ভারতীয় কূটনীতিক দেবযানী খোবড়াগাড়ের মামলা বন্ধ করে দেওয়া এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কালো তালিকা থেকে সাদায় প্রত্যাবর্তনের মতো ইস্যুও।

বড় গুরুত্বের বিষয় হচ্ছে এতদিন আমেরিকার অঙ্গুলিহেলনে বা তার একপক্ষীয় আদেশ তামিল করা থেকে আমরা আলোচনার মাধ্যমে কতটা বেরোতে পারব। যেমন বিদেশী বাণিজ্যকে চাঙ্গা করার নামে বীমাক্ষেত্রে ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনে বিদেশী বিনিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে। আমেরিকান অস্ত্র কোম্পানিগুলিকে ভারতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের বিশাল বরাত দেওয়া হয়ে থাকে। কৃষি সংক্রান্ত বাজারেও তাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। পারমাণবিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কোনো আকস্মিক বিপর্যয় ঘটলে অংশীদার হিসেবে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে আমাদের স্বপক্ষে বৃদ্ধি ঘটানো হবে কিনা এই প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত। এগুলির ব্যাপক পর্যালোচনা দরকার।

পাকিস্তান :

একই প্রতিচ্ছবি পাকিস্তানের বেলাতেও, যতই আমরা তাদের কাছাকাছি পৌঁছই না কেন তাদের আবদার যেন সীমাহীন। আজও আমরা এই হতাশাজনক পরিস্থিতি থেকে বেরোতে পারলাম না। এর মূল কারণ হচ্ছে আমরা মনে প্রাণে পাকিস্তানের সঙ্গে আদান প্রদান চাই। অথচ পাকিস্তান দীর্ঘকাল ধরে তাদের অবস্থানে অনড় রয়েছে যে ভারতই সব রকমের শান্তি প্রক্রিয়া ভেস্তে দেয় তাদের আন্তরিক 'হাত বাড়ালেই বন্ধু'র আন্তরিক ভূমিকা সত্ত্বেও। এর মধ্যে নওয়াজ শরিফের সাম্প্রতিকতম শুভেচ্ছা সফরের সুযোগেও কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যম নিতে ভারত ব্যর্থ হয়েছে বলেই তাদের প্রচার। খুব স্বাভাবিকভাবেই সামরিক বাহিনী ও মৌলবাদীদের আদেশ অমান্য করে শরিফের এই শপথ সফর যে নিষ্ফলা হয়েছে তা প্রমাণ করতে তাদের স্বার্থান্বেষী মহল উঠে পড়ে লেগেছে।

মনে রাখতে হবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি বলতে পাকিস্তান বোঝে রাতারাতি কাশ্মীরের ব্যাপারে একটা পাকাপাকি এমন ফয়সালা যাতে পি ও কে (পাক-অধিকৃত কাশ্মীর) তাদের ম্যাপে ঢুকে যায় বা দু'দেশের জল বণ্টন তাদের অনুকূলে হয়। ভাল কথা, তবে এর বিনিময়ে তারা ভারতে সন্ত্রাসবাদের চালান কমানো, মুম্বাই বিস্ফোরণের আসামীদের বিচার ত্বরান্বিত করা, জিহাদি সন্ত্রাসবাদীদের ওপর লাগাম দেওয়া এই অতি আপৎকালীন বিষয়গুলিতে আদৌ উৎসাহী নয়। এই কারণেই খুব চালাকি করে নওয়াজ শরিফ দাবি করে গেছেন পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের সব থেকে বড় ভুক্তভোগী আর ভারতের তরফে অভিযোগগুলি নিতান্তই ভিত্তিহীন। তাঁর মতে দরকার দু'দেশের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। বেশ গালভরা কথা!

ভারতের দৃষ্টিকোণ :

নতুন সরকার যে সমৃদ্ধ ও সশক্ত ভারত গড়ার নীতি নিয়েছে তা সর্বাংশে সঠিক। এই প্রচেষ্টায় সরকার সকলকেই অংশীদার করে বা সঙ্গে নিয়ে এগোতে ইচ্ছুক। যারা আগে থেকেই সঙ্গে আছে তারা তো বটেই, সম্ভাব্য যারা আসতে পারে তাদেরও টানতে হবে। এই চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পারস্পরিক যোগদান (Reciprocity) যাদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা হবে তাদেরও দায়বদ্ধতা থাকা বাধ্যতামূলক। আগে বর্ণিত বিষয়গুলি সবই একপাক্ষিক ঘটে চলেছে যা যথার্থ দ্বিপাক্ষিক হওয়া আশু প্রয়োজন। এটা তখনই সম্ভব হবে অর্থাৎ তারাও হাত বাড়াবে যখনই বুঝবে আমাদের পরিকল্পনার পেছনে রয়েছে পুঞ্জীভূত জাতীয় শক্তি অর্থাৎ নিজ বলে শক্ত ভারত।

(লেখক প্রাক্তন বিদেশ সচিব)

পরিবেশ সংরক্ষণ আমাদের সুবিধা কী ?

প্রবীর ঘোষ

"চলে যাব, তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

'পরিবেশ' জিনিসটা কী ? সংক্ষেপে সহজভাবে বলা যায় : বাড়ি-ঘর, গাছপালা, মানুষ-প্রাণী, নদ-নদী, অফিস-কাছারি, স্কুল- কলেজ, পশু-পাখি, বাজার-হাট, আকাশ-বাতাস ইত্যাদি সব নিয়েই পরিবেশ। এই পরিবেশ শব্দটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়েছে— মানে হাঁড়ি ও সরার সম্পর্কের মতো যুক্ত হয়েছে— দূষণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ইত্যাদি। পরিবেশ সংরক্ষণের ঘটনাও

আজ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। 'পরিবেশ' শব্দটির সঙ্গে পরিচয় থাকলেও তার অন্তর্নিহিত অর্থ বা ব্যাখ্যা আমাদের অনেকেই তেমনভাবে জানি না; সেই পরিবেশ আবার 'সংরক্ষণ'! নিশ্চিত একটু জটিল বা কঠিন বিষয়। ফল, সবজি, আসন ইত্যাদির সংরক্ষণের কথা শোনা গেলেও পরিবেশ সংরক্ষণের কথা কম শোনা যায়।

আলো, বাতাস, জল, কুয়াশা, তুষার, তাপ, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি আবহবিজ্ঞানের বিষয়গুলি যেমন পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত— তেমনিভাবে ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যাই বেশি। নদীমাতৃক উভয়বঙ্গেই মৃত্তিকার দিক দিয়ে আবার সমভূমি অঞ্চলই অধিক। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ভৌগোলিক পরিবেশ ছাড়াও আরো নানান রকমের পরিবেশ আছে। যেমন উৎসবের পরিবেশ, অফিসের পরিবেশ, লাইব্রেরি বা পড়াশোনার পরিবেশ, পরীক্ষা হলের পরিবেশ, হাটবাজারের পরিবেশ, যুদ্ধ ও শান্তির পরিবেশ, রাজনীতির পরিবেশ ইত্যাদি প্রচুর বিষয়ের নাম করা যায়। তাছাড়া, বাল্যজীবন, ছাত্রজীবন, চাকরিজীবন, হস্টেলজীবন, আশ্রমজীবন— এসবও তো আছে।

পরিবেশ দূষণ হচ্ছে বলেই আজ সংরক্ষণের কথা বিশেষভাবে ভাবার দরকার হয়ে পড়েছে। ভারতের বহু শহরে, গ্রামে-গঞ্জে 'পরিবেশ দিবস' পালিত হয়। আসল কারণ, পরিবেশকে যাতে আমরা দূষিত না-করি। দূষিত করলে আমাদের অর্থাৎ দেশের ক্ষতি হয়। এই পরিবেশ দূষণের কথা আলোচিত হয় সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম শহরে। ১৯৬২ সালের ৫ জুন ওই শহরে মানুষের পরিবেশ বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রথম আলোচনা সভা বসে। ১১৩টি দেশের প্রতিনিধিরা তাতে যোগ দিয়েছিলেন।

পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বোধকরি মধ্যপ্রদেশের ভোপালের দুর্ঘটনাটি— যা আমাদের অনেকেরই জানা। ১৯৮৪-র ৩ ডিসেম্বর সোমবার (১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৯১) এই ঘটনা ঘটেছিল ইউনিয়ন কার্বাইডের গ্যাসচেম্বার থেকে বিষাক্ত গ্যাস বাইরে ছড়িয়ে যাওয়ায়। বায়ুদূষণের ফলেই ওই দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষ মারা যান এবং অগণিত মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভোপালের ঘটনা মনে পড়লেই জাপানের হিরোসিমা, নাগাসাকির কথাও মনে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা সেখানে পরমাণু বোমা ফেলায় বহু মানুষ প্রাণ হারান এবং তারই জের হিসাবে পরিবেশ দূষণের বোঝা এখনও জাপানকে বইতে হচ্ছে— রোগ, ব্যাধিগ্রস্ত শিশুর জন্মের মধ্য

দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে আন্ত্রিক রোগের মড়ক লেগেছিল একসময়। এখনও ওই রোগ কোথাও কোথাও দেখা যায়। এরও কারণ ওই পরিবেশ দূষণ বা দূষিত জলপান করা। কলকারখানার ধোঁয়া, ইটখোলার ধোঁয়া, রেল ও মোটর গাড়ি, বিড়ি, সিগারেট, উনুন প্রভৃতির ধোঁয়া বাতাসকে দূষিত করে পরিবেশকে ক্ষতিকর করে তোলে। অনেক শহরে তো বটেই, দেশের বহু স্থানেই আজ বাতাস দূষিত হয়ে আমাদের পরিবেশকে নষ্ট করছে— পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম তাজমহলেরও ক্ষতি হওয়া শুরু হয়— মথুরার তৈল শোধনাগারের জন্যে। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলও দূষিত বাতাসের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবেশ নানান কারণে দূষিত হওয়ার ফলে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনিতেই দরিদ্র এই দেশের মানুষের পুষ্টি, পানীয় জল এবং বাসগৃহে আলো-বাতাসের অভাব তো আছেই। ফলে, সুস্থ ও সবলদেহ মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং যার জন্য সুস্থ, সুন্দর চিন্তাভাবনা, সঠিক কাজকর্ম, উৎপাদন ইত্যাদিও কমের দিকে। পরিবেশ দূষণের কারণ কি এবং তা সংরক্ষণের উপায় কি? সমস্ত রকম অসুবিধার মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব। তাছাড়াও গাছপালার বিনাশ, দারিদ্র, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জল, বাতাস, মাটি, তাপ, শব্দ, কলকারখানা, যানবাহন, যুদ্ধবিগ্রহ—সর্বোপরি বিজ্ঞানের নানান ক্রমোন্নতির জন্য পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে কি কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদি থাকবে না? উত্তরে বলতে হয়, থাকবে না— তা নয়—তবে সবকিছুর একটা ভারসাম্য আছে, সঠিক প্রয়োগ ও সংরক্ষণের ব্যাপার আছে— যা আমরা সাধারণত মেনে চলি না। দূষিত গ্যাস বাইরে ছাড়ার আগে, তা শোধন করে ছাড়লে পরিবেশের ক্ষতি অনেক কম হয়। খাবার জল দূষিত যাতে না হয় (টিউবওয়েলের চারধার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ময়লা-নোংরা-আবর্জনা না ফেলা বা জমতে না দেওয়া, হাঁসমুরগি, ছাগল-ভেড়াদির মলমূত্র না জমা ইত্যাদি কাজে সচেতন থেকে বাস্তবায়িত করা...), রান্নাঘরকে যতদূর পারা যায় ধোঁয়ামুক্ত করা, জমিতে কীটনাশক-ওষুধ ব্যবহার পদ্ধতি সঠিকভাবে মানা ইত্যাদি। কলকারখানা লোকালয় থেকে দূরে তো বটেই, একটি থেকে আর একটির দূরত্বই অনেক বেশি হওয়া উচিত। একাজে সরকার এবং জনগণের বিশেষ সচেতন হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। যানবাহন, কলকারখানা, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। পরিবেশ দূষণ দূর করার জন্যেও নানান প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে।

আবদ্ধ স্থানে ধূমপান না করা— বিশেষ করে শিশুদের সামনে বা কাছাকাছি, খারাপ টায়ার-টিউব যেখানে সেখানে না পোড়ানো, ময়লা আবর্জনা না পচতে দেওয়া, এবং যেখানে সেখানে না ফেলা, নালা-নর্দমা অপরিষ্কার না রাখা, যেখানে-সেখানে মরা পশু-পাখি- জীবজন্তু না ফেলা, কলকারখানা দূষিত পদার্থ নদ-নদীতে না-ফেলা, জাহাজ, তৈল শোধনাগার থেকে সমুদ্রে তেল না ফেলা, শৌচাগারের নোংরা জল সর্বত্র না যাওয়া, যত্রতত্র পায়খানা-পেচ্ছাব না করা, যে কোনো পুকুরেই গবাদিপশু স্নান না করানো ইত্যাদি সব ব্যাপারে আমরা স্বচ্ছন্দে সচেতন হতে পারি। এবং এসব ক্ষেত্রে পরিবেশকে দূষিত না করে সংরক্ষিত করা আমাদের হাতেই। এসব কাজ খুব পরিশ্রমের কাজ নয়--- দরকার হলো, এগুলির যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটু কষ্ট স্বীকার করে সু-অভ্যেস গড়ে তোলা। এই সু-অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য চাই সংগঠন— যে সংগঠনের কাজ হবে— পরিবেশ উন্নয়নের। সহজভাবে বলা যেতে পারে--- দরকার 'পরিবেশ রক্ষাবাহিনী'।

আমাদের রাজ্যে পরিবেশ দপ্তর খোলা হয় সরকারিভাবে ১৯৮২ সালে। ভারত সরকারের পরিবেশ দপ্তর ১৯৮০ সালে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠন হয় ১৯৭৪-এ। দেখা যায়, পরিবেশের সঙ্গে দারুণভাবে জড়িয়ে আছে মাটি, জল, বায়ু, গাছপালা (অরণ্য) ও প্রাণী (মানুষ)। কেন এগুলির নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে? তার কারণ, মাটি থেকে আমরা— মানুষ ও প্রাণী পাচ্ছে তাদের জন্য উৎপাদিত পণ্য বা খাবার, জলই তো জীবন এবং বাতাস ছাড়াও মানুষ বা প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না, আর গাছপালা তো জীব-জগৎ-প্রাণীর জন্য অপরিহার্য। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পুকুর বা জলাশয় বা জলাধার রক্ষণাবেক্ষণের অবশ্য দরকার; গাছপালা বা অরণ্য ধ্বংস বা বিনাশ রুখে, বিভিন্ন প্রজাতির গাছগাছালি (ফলের গাছ, ভেষজ গাছ, জ্বালানি কাঠের জন্য গাছ, আসবাবপত্রের জন্য শক্ত কাঠের গাছ...) লাগানো ও বাঁচানো দরকার।

আমাদের সুপরিচিত বহু পরিবারেই রান্নার কাজে আজকাল গুঁড়ো মশলার ব্যবহার করতে দেখা যায় বেশি। কিন্তু অনেকে হয়তো জেনেও বুঝতে চান না, গুঁড়ো মশলাদিতে ভেজাল দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে এবং তার ফল মারাত্মক রূপে দেখা দিতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, গুঁড়ো হলুদের সঙ্গে ভেজাল হিসাবে সীসার ক্রোমেট লবণ মেশানো যায়। সীসা দূষিত ধাতু। সীসার লবণ শরীরে ঢুকলে তা আর বেরোয় না। পরবর্তী সময়ে ওই সীসা-লবণ থেকেই জন্মায় অবসাদ এবং ওই-বিষয়ক পক্ষাঘাত। হলুদ একটু বেটে নিলেই এই দূষণ বা অসুস্থতা থেকে সহজে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।

পরিবেশ ভালো রাখার ব্যাপারে সরকারি দায়-দায়িত্ব, আইনকানুনের সঠিক প্রয়োগের সঙ্গে আমাদেরও কর্তব্য রয়েছে। পরিবেশ ভালো রাখা বা সংরক্ষণের সঙ্গে সমাজ উন্নয়ন এবং দেশকল্যাণের সম্পর্ক জড়িত। তাই সর্বত্র--- বিশেষত স্কুল কলেজ অফিস কলকারখানা এবং পারিবারিক-পরিবেশ ভালো রাখার ব্যাপারে সৎ শিক্ষিত কর্তৃপক্ষের অবদানও যথেষ্ট। খুবই দরকার রাজ্যে-দেশের প্রাইমারি স্কুল পাঠ্যবই থেকে পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের শেখানো, সচেতন করা। শিশুকাল থেকে এসব শিখলে ভবিষ্যৎ জীবনে তা হয় খুবই কাজের ও প্রয়োজনীয়। পঞ্চ 'ম'-কারের (মদ, মাংস, মাছ, মুদ্রা, মৈথুন) খারাপ দিকটি বাদ দিয়ে, আমাদের নিতে হবে পঞ্চ 'জ'-কারের ভালো দিক। অর্থাৎ জমি, জল, জ্বালানি, জনগণ, জীববৈচিত্র্য— হলো পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের প্রধান হাতিয়ার।

(লেখক 'বর্ণালী' পত্রিকার সম্পাদক)

মোদী সরকার ও বাজার

শ্যামলকুমার হাতি

বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী বলেছিলেন, ‘‘আচ্ছে দিন আনে বালা হ্যায়’’। প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী পরিষদকেও দ্রুত কাজ সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের কাছে ১০০ দিনের কাজের রূপরেখা চেয়ে পাঠিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বিভাগীয় সচিবদের কাছ থেকেও পরামর্শ নিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য এক। অর্থনীতির চাকার মোড় ঘোরানো, দুর্বল অর্থনীতিকে সবল করা, মুদ্রাস্ফীতির হার কমানো, বৈদেশিক ব্যবসা বাড়ানো। মানুষ যদি শুদ্ধ হৃদয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চায় তা হলে স্বয়ং ভগবান তাঁর পাশে দাঁড়ান। যাঁরা একটু আধটুও অর্থনীতি বোঝেন তাঁদের এই পরিবর্তন নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে।

গত তিন মাসের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের দাম সবচেয়ে বেশি কমেছে মে মাসে। খুচরো বাজারে সবজি, ডাল এবং প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ও দুধের দাম সবই কমেছে এই মে মাসেই। মে মাসেই মুদ্রাস্ফীতি গত এপ্রিল মাস থেকে কমে দাঁড়িয়েছিল ৮.২৮ শতাংশ। এপ্রিল মাসে তা ছিল ৯.৬৬ শতাংশ।

গরিব এবং প্রান্তিক মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হৃদয় কতটা উদ্বেলিত তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পেলাম গত ১১ জুন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমর্থনে লোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, কৃষির সুবিধার জন্য ১২ ক্লাস বিদ্যালয়ের ল্যাবোরেটরিগুলোতে মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে। তাতে কৃষকের সুবিধা হবে। এর আগে তো কারও কাছে এমন কথা শোনা যায়নি। তাই তিনি সবার জন্য ছাদ, জল এবং বিদ্যুৎ-এর কথা বলেছেন। শহর ও গ্রামের সমান উন্নতি করার কথা বলেছেন। তিনি আহ্বান করেছেন যে যেই কাজই হোক না কেন ভাবনার মধ্যে যেন দেশ থাকে। সে যেন দেশের জন্যই কাজ করে। দুঃখের কথা, পরের দিন কোনো সংবাদপত্রে এ সব খবর লেখা হলো না। বড় বড় করে এল প্রধানমন্ত্রী মমতার প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা দিলেন ইত্যাদি। নরেন্দ্র মোদীর ভারত-ভাবনা সেখানে স্থান পায়নি।

মোদীজী জানেন বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি কমাতে না পারলে টাকার দাম বাড়ানো যাবে না। এযাবৎকাল আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি রপ্তানির থেকে বেশি ছিল। তার জন্য আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিত। মোদীজী দায়িত্ব নেওয়ার পর আমাদের রপ্তানি বেড়েছে, আমদানি কমেছে। গত বছরের তুলনায় ১২.৪ শতাংশ রপ্তানি বেড়ে মে মাসে তা দাঁড়িয়েছে ২৮০০ কোটি ডলারে। টাকায় তা ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকা। এই একই সময়ে আমদানি ১১.৪ শতাংশ কমে ৩৯২৩ কোটি ডলার হয়েছে। তা হলো ২.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর ফলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে তা দাঁড়িয়েছে ১১২৩ কোটি ডলারে অর্থাৎ ৬৭ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। গত বছর এই মে মাসে তা ছিল ১৯৩৭ কোটি ডলার। ভারত আবার তার রপ্তানির বাজার ফিরে পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী রপ্তানিতে চীনের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের এগিয়ে যেতে বলেছেন। সরকারের উপর আস্থা রেখে উদ্যোগী শক্তি এবং যুবশক্তি এগিয়ে এলেই আমরা আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের মোড় ঘোরাতে পারব।

শিল্পের উৎপাদনের দিকেও সরকার সমান ভাবে নজর দিয়েছেন। সেই সঙ্গে উৎপাদনের মাত্রাও বেড়েছে। Index of Industrial Production (IIP) দেখিয়েছে গত বছর যা ছিল ১.৫ শতাংশ তা এই একই সময়ে এবছরে বেড়ে হয়েছে ৩.৪ শতাংশ। খনিজ শিল্পে ১.২ শতাংশ বেড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১১.৯ শতাংশ হয়েছে যেটা গত বছর এই একই সময়ে ছিল ৪.২ শতাংশ।

এতো সবে শুরু। আবহাওয়াবিদরা আশঙ্কা করছেন যে এবারে বর্ষা কম হবে। তার জন্যও সরকার বসে নেই। কম বর্ষার মার থেকে কীভাবে কৃষককে বাঁচানো যায়, কীভাবে চাষবাস বাঁচানো যায় তার জন্য সরকার সব রকমের ব্যবস্থা নিচ্ছে। এখন থেকেই তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। ইউপিএ-র কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ারের মতো মোদী সরকারের কেউ আগাম বলে দিচ্ছেন না যে দাম বাড়বে। বরং সরকার বলছে দাম বাড়লে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এরপর সরকার বাজেট পেশ করবে। তার জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর সঙ্গেও কথাবার্তা শুরু করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের সঙ্গেও কথা হয়েছে। কথা শুরু হয়েছে শ্রমিক সমাজের সঙ্গেও। তবে দীর্ঘদিন ‘করে খাওয়া’ পার্টিগুলো চুপচাপ বসে থাকবে না। সুযোগ পেলেই ঘেঁটে ‘ঘ’ করে দেওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখছে তাঁরা। তারা যা পারেন করুন। সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করলেই হলো। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

জাতীয়তাবোধ দেশাভিমানের জননী

অমলেশ মিশ্র

স্বাভিমান বা আত্মমর্যাদাবোধ ব্যক্তি বিশেষের সম্পদ। শিরদাঁড়া সোজা রাখে, যে কোনো সুবিধার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। স্বাভিমান কিছুটা তৈরি হয় বংশ কৌলিন্যে, অনেকটাই নিজের বোধ-বুদ্ধিতে। আত্মমর্যাদাবোধ স্বাভিমানের অঙ্গ। স্বাভিমানকে অহঙ্কারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা বা মিশিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। স্বাভিমান বজায় রাখতে যতটুকু অহঙ্কার রাখা দরকার, ততটা অহঙ্কারই ভাল। তার বেশি অহঙ্কার মানবধর্মের ক্ষতি করে।

জাগ্রত ভারতে আমরা ভারতের স্বাভিমান বা ভারতের মর্যাদাবোধ দেখতে চাইব। ভারতের স্বাভিমানের ক্ষেত্রে ভারতের অতীত ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ যে যুগে একটি যুক্তরাষ্ট্র তৈরি হয়নি, সে যুগেও পৃথক পৃথক ভাবে রাজস্থান, গুজরাট, পাঞ্জাব, কলিঙ্গ, পাণ্ড, কেরল, বিজয়নগর প্রভৃতি রাজ্যগুলি স্বাভিমান রক্ষার কাজে পরাঙ্মুখ ছিল না। দেশের স্বাভিমানকে আমরা দেশাভিমান বলতে পারি। ভারতে যখন রাজচক্রবর্তীরা রাজত্ব করেছেন, তখনও দেশাভিমান তাদের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় সম্পদ বলে বিবেচিত হোত। চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, অশোক, পুষ্যমিত্র, রাণা প্রতাপ, শিবাজী— অনেক নামই ইতিহাসে পাওয়া যায়, যাঁরা দেশাভিমানকে অতি উচ্চস্থানে রেখেছিলেন।

ভারতের বাইরের দেশগুলির মধ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, জাপান, অধুনা আমেরিকা ইত্যাদি দেশ অতি পরিশীলিত ভাবে দেশাভিমান নিয়ে সতর্ক থাকে। ১৯৪৭ এর পর যখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দেশের মানুষের হাতে হস্তান্তরিত হলো— তখন থেকেই দেশাভিমানে ঘাটতি দেখা গেল এবং বর্তমানে তা বেশ প্রকট। দেশাভিমানে ঘাটতি থাকার একটি বড় কারণ ছিল— ভারতের অতীত গৌরব সম্পর্কে অচেতনতা। ভারতের থেকে ইংল্যান্ড ভাল এবং সেই দেশকেই অনুকরণ করলে ভারত অগ্রসর হবে— এ মারাত্মক ক্ষতিকর ভাবনা আমাদের দেশাভিমানের মূলে আঘাত করেছে।

'ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে' —এই কথাগুলি বিস্মৃত হওয়া গেল। বিস্মৃত না হলেও কথাগুলিতে বিশ্বাস থাকল না। কোনো কোনো কবি মনে করিয়ে দিতে চাইলেন এই কথা বলে যে,

'সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি'।

কিন্তু কোথায় কি? ভারতবর্ষকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ীপদ হলো না, আজ চীন আক্রমণ করছে তো কাল পাকিস্তান আক্রমণ করছে। জমি দখল হয়ে যাচ্ছে। ভারতের জমিতে বিদেশের রেলপথ নির্মিত হচ্ছে, ভারতীয় সৈনিকদের মাথা কেটে নিচ্ছে, কোনো দেশ দাবি করছে যে, সে দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে সম্প্রদায়গত ভাবে ইসলামি হতে হবে। এতটুকু যে দেশ বাংলাদেশ, সেও ছিটমহল বিনিময়ে ভারতকে অগ্রাহ্য করছে। অর্থের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক, আমেরিকা ইত্যাদির কাছে ভারতকে সর্বদা হাত পেতে থাকতে হচ্ছে।

দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাভিমানের এতই অভাব যে দেশের প্রয়োজনে নিজের স্বার্থ সামান্যটুকু ছাড়তেও কেউ রাজি নয়। সাধারণ মানুষের মনেও স্বার্থপরতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে।

কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন— In countries where the government and political environment is honest, generally you will find that the people are honest, helping and law-abiding. And the reverse is true.

স্বাভিমান বা আত্মমর্যাদাবোধ না থাকলে মানুষ যেমন ভিখিরি মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়, দেশাভিমান না থাকলে দেশও ভিখিরি মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়। আর ভিখিরিকে কে-ই বা মর্যাদা দেয়?

সমস্ত বিষয়ে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গিই সব থেকে বড় নির্ণায়ক। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের দেশ ভূমিমাত্র নয়, আমাদের দেশ আমাদের মা। এই দেশের মা ও মানুষকে অনেকেই মাটি করে দেওয়ার মতলবে আছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ আমাদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিনাশ ঘটাচ্ছে।

জাগ্রত ভারত পেতে গেলে এই দেশাভিমানকে জাগ্রত করতে হবে। জাতীয়তাবোধ দেশাভিমানের জননী। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর
তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

গোপালী আশ্রমের ছাত্রাবাস

সেবাকেন্দ্র গোপালী আশ্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রুক্ষ শুস্ক মালভূমি এলাকা। ভালোমতো বৃষ্টি না হলে চাষের কোনো আশা নেই। গ্রীষ্মকালে আগুনের হলকা বয়ে যায়। দূরে দূরে বনবাসী গ্রাম। শিক্ষাদীক্ষা নেই। আধিকাংশ সময় খাবারই জোটে না। অভাবের সুযোগ নিয়ে খৃস্টান মিশনারীরা হানা দেয়। দু'মুঠো গমের বদলে তাদের ধর্ম কেড়ে নেয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি বদল করার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসেন কয়েকজন দেশভক্ত মানুষ। তাঁদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে কলকাতার মানব সেবা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠিত হয় গোপালী আশ্রম।

১৯৭৪ সালের বিজয়াদশমীর দিন বনবাসী সমাজের কয়েকজন দরিদ্র ও অনাথ বালককে নিয়ে আশ্রমের পথ চলা শুরু। খড়্গপুর রেলস্টেশন থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই আশ্রম। আশ্রমের বিশেষতা হলো শুধুমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে আবদ্ধ না থেকে শিক্ষা ও সমাজসেবাকে তাদের অঙ্গ করে নিয়েছে।

আশ্রমে প্রবেশ করতেই ভব্য শিবমন্দির চোখে পড়বে। এই শিব মন্দিরই আশ্রমের পরিচিত। কলকাতার ভাগচন্দ পরিবারের সহযোগিতায় এই মন্দির তৈরি হয়েছে। মন্দিরের শিলান্যাস শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য শ্রীঅভিনব বিদ্যাতীর্থ মহারাজের হাতে হয়েছে। মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন কাঞ্চী কামকোটী পীঠের শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতী মহারাজ। মন্দিরে প্রতিদিনই ভক্তের ভিড় লেগে থাকে। শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, গীতাজয়ন্তী উৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। চারপাশের বনবাসী সমাজের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসবে অংশগ্রহণ করে। ছাত্রাবাসের বনবাসী ছাত্ররা সকাল ও সন্ধ্যায় ভজনারতি করে। শুভ্রবেশে বনবাসী বিদ্যার্থীরা যখন মন্দিরে সমবেত হয় তখন গোপালী আশ্রমকে প্রাচীনকালের তপোবনের কোনো আশ্রম মনে হয়।

আশ্রমের জন্মলগ্ন থেকেই আশ্রমে ছাত্রাবাস শুরু হয়েছে। মন্দির ও ছাত্রাবাস দিয়েই আশ্রমের শুরু। ছাত্রাবাসে বনবাসী সমাজের দরিদ্র ও অনাথ শিশুদেরই নিঃশুল্ক থাকার ব্যবস্থা আছে। এখানে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে অনুশাসন, জাতীয় একতা, সংস্কৃতি ও স্বচ্ছতার শিক্ষা দেওয়া হয়। আশ্রম কর্তৃপক্ষের সেবাধর্মের পরকাষ্ঠা দেখে মেদিনীপুরের স্বর্গীয় রঘুনাথ লোঢ়ার পরিবারের সহায়তায় একশ' ছাত্রের জন্য নতুন ছাত্রাবাস তৈরি হয়েছে। তাছাড়া এলাকার কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি আশ্রম পরিসরেই ১৯৮৮ সালে সরস্বতী শিশু মন্দির স্থাপন করেছেন। ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকায় ১৯৯৬ সালে সারদা শিশু মন্দির শুরু হয়েছে। সেবাব্রতী যুবক-যুবতীরা নামমাত্র মানধনের বিনিময়ে আশ্রমের বিদ্যালয় দু'টিতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন। আশ্রমের মন্দিরের পাশেই একটি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন রকমের বইপত্র পাওয়া যায়। তারপাশেই আর একটি ভাণ্ডারে নিত্যপ্রয়োজনীয় স্বদেশী জিনিস পাওয়া যায়। সকাল বিকাল নিয়ম করে ভাণ্ডার খোলা থাকে।

আশ্রমে একটি গোশালা আছে। শঙ্করলাল সরোগীর সহযোগিতায় এটি শুরু হয়েছে। এছাড়া খড়্গপুরের গুজরাটি সমাজের মুনি মহারাজের প্রেরণায় গুজরাটি সমাজ গোশালা নির্মাণের জন্য অর্থ দিয়েছে। গোশালা ভালোভাবে চালানোর জন্য গুজরাটি সমাজ দানপাত্র যোজনা তৈরি করেছে। খড়্গপুরের ২০০ পরিবারে দানপাত্র রাখা আছে। গোশালার দুধ বিক্রি করা হয় না। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের জন্যই রাখা হয়। গোশালার গোবর থেকে গোবর গ্যাস প্রকল্প চলে। এ থেকে যে গোবর সার পাওয়া যায় তা আশ্রমের জমি ও বাগানে ব্যবহার করা হয়। বছরে অনেক সার বিক্রিও করা হয়।

পাহাড়পুর কুলিং টাওয়ার্স আশ্রমে জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই জল শুধু আশ্রম ও ছাত্রাবাসেই ব্যবহার হয় না, তা আশেপাশের কয়েকটা বনবাসী গ্রামেরও জলের চাহিদা পূরণ হয়। আশ্রমের একদিকে জমিতে চাষবাসের কাজ চলে। সেখানে ফল ও বিভিন্ন রকমের সবজি চাষ করা হয়। খড়্গপুর আই আই টি'র কৃষিবিশেষজ্ঞদের পরামর্শে চাষ করা হয়। উৎপন্ন ফল ও সবজি আশ্রমেই ব্যবহার করা হয়। আশ্রম দ্বারা আশেপাশের ১০টি গ্রামে ভজনমণ্ডলী চলে। ভজনমণ্ডলীতে কীর্তন, রামকথা, গীতাপাঠ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনা জাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রমের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় থেকে বনবাসীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। অনুভাবী কার্যকর্তা বিদ্যুৎ দত্ত আশ্রমে অভিভাবকরূপে কাজ করে চলেছেন। এলাকায় আজ শ্রদ্ধার কেন্দ্র রূপে গোপালী আশ্রম স্বমহিমায় বিরাজ করছে। ■

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

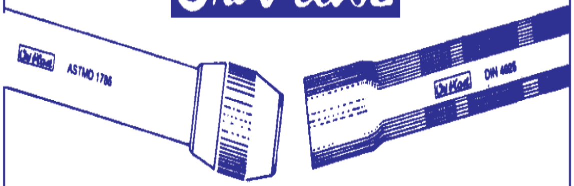

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ভারতবর্ষ এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র। একসূত্রে গ্রথিত ভারতীয় চিন্তারাশির একটি যথোপযোগী নাম হিন্দুধর্ম।
হিন্দুধর্ম, জগতের অতি সূক্ষ্ম ও সুসংবদ্ধভাবে বর্ধিত ধর্মসমূহের অন্যতম। এই ধর্ম বিষয়ে ধারণা করার অসুবিধা হয় তখনই, যখন মনে থাকে না, এটি একটি স্বতঃ-উৎসারিত উপলব্ধি, মনুষ্যসৃষ্ট সংগঠন নয়; যখন মনে থাকে না, এটি একটি প্রাণবন্ত বৃক্ষস্বরূপ, যন্ত্র নয়।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

নানান কিংবদন্তীতে ভরা ঢাকেশ্বরী মন্দির

রমাপ্রসাদ দত্ত

ঢাক শব্দটার সঙ্গে ঢাকা নাম জড়িয়ে আছে। বাংলার শাসনকর্তা ইছলাম খাঁ ওই নাম দেন। একদল ভক্তকে ঢাক বাজিয়ে পুজো করতে দেখেন বুড়িগঙ্গার তীরে। রাজমহল থেকে মেঘনার উপকূলে বাংলার রাজধানীকে আনতে চেয়েছিলেন। উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষপর্যন্ত ঢাকের আওয়াজ শুনে নেমে একটা পছন্দসই জায়গায় ঢাকীদের ডাকলেন। বললেন, জোরে জোরে ঢাক বাজাতে। ঢাকের আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছোল ততদূর পর্যন্ত রাজধানীর সীমা ঠিক হলো। অবশ্য এটা প্রবাদ কাহিনী। তবে 'ঢাক' শব্দটা থেকে যে ঢাকা এসেছে তা একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই। কথিত আছে, দক্ষযজ্ঞের সময় সতীর প্রাণহীন দেহ নিয়ে শিবের তাণ্ডব নৃত্যে যখন চারদিকে প্রলয় ঘটার অবস্থা তখন বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে সতীর দেহকে একান্ন খণ্ড করে নানান জায়গায় ফেলেন। ঢাকায় পড়েছিল সতীর মস্তকভূষণ। এটি একটি উপপীঠ। অন্য কথা রয়েছে, ওই অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ ছিল। তাই থেকে নাম ঢাকা। আরেক কথা, রাজা বিজয় সেনের স্ত্রী ঢাকগাছ ভরা অঞ্চলের মধ্যে দুর্গামূর্তি দেখতে পান। জঙ্গল ভর্তি জায়গায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে মন্দির তৈরি ও দুর্গাদেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই থেকে দেবীমূর্তির নাম ঢাকেশ্বরী। আবার ইতিহাস লেখকরা জানিয়েছেন ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে নাম ঢাকেশ্বরী। এটাও অনুমানভিত্তিক মত। কত বছর ঢাকেশ্বরী দেবী ভক্তদের পুজো পাচ্ছেন জানা যায় না। তবে মন্দিরের গড়ন দেখে বোঝা যায় এর মধ্যে বৌদ্ধ স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। রাজা মানসিংহ ঢাকায় চারপাশে প্রচুর মসজিদের মধ্যে মন্দির খুঁজে পান। তাঁর উদ্যোগে মন্দিরের সংস্কারের কাজ হয়। কারও কারও মতে এটি বৌদ্ধ মন্দির। পরে তার রূপ বদল হয় হিন্দু মন্দিরে। মন্দিরের ইতিহাস ঠিকমতো জানা না গেলেও মন্দিরটি এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অনেক প্রতিকূলতার আঘাত সহ্য করে। চারপাশে মসজিদ, তার মধ্যে হিন্দু

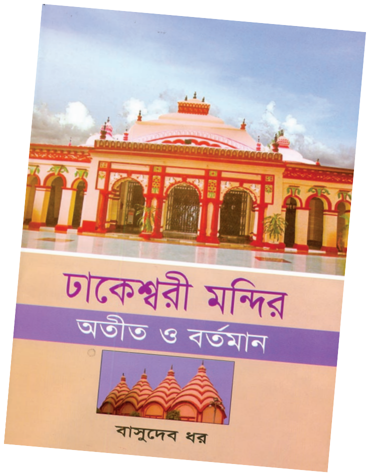

মন্দিরটিকে অনেকরকম আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে। দেশ ভাগের আগে এবং পরে একদল উগ্র মুসলমান চেয়েছে মন্দিরকে নিশ্চিহ্ন করতে। শুভশক্তির জয় হয়েছে। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের গৌরব বজায় রয়েছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ওই মন্দির। মন্দির দখলের জন্যে হামলা হয়েছে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবার পরে ওই মন্দির রক্ষা ও সংস্কারের জন্যে বড় অঙ্কের অর্থবরাদ্দ করেন। মন্দিরে ২০১০ সালে বড়রকম চুরি হয়। অনেক ক্ষতি হয় মন্দিরের। অবশ্য একই সময়ে বাংলাদেশের অন্য কয়েকটি মন্দিরে চুরি হয়েছে প্রায় একই পদ্ধতিতে। কোনও কিনারা হয়নি।

বাসুদেব ধর নিজের করতলের মতো চেনেন বাংলাদেশকে। সাংবাদিকের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। সেখানকার সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি ধর্মচর্চার কথা তুলে ধরেছেন নানাভাবে। ঢাকেশ্বরী মন্দির নিয়ে লেখা বইটিতে সংযোজিত হয়েছে অনেক আলোকচিত্র। যাকে মূল্যবান নথি বলা যায়। আমাদের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ঢাকা সফরে গিয়েছেন। তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন কেউ কেউ, ঢাকায় গিয়ে অবশ্য দেখবেন ঢাকেশ্বরী মন্দির, ইলিশ মাছের স্বাদ নেবেন, ঢাকাই শাড়িও দেখবেন। বিদেশমন্ত্রী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছেন। এতে সেদেশের হিন্দুদের মনোবল বাড়বে।

ঢাকেশ্বরী মন্দির : অতীত ও বর্তমান। বাসুদেব ধর। নিখিল প্রকাশন ৮/৯ প্যারীচাঁদ রোড ঢাকা ১৮০০। দাম : ১০০ টাকা।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন সুষমা স্বরাজ।

সমাজ সেবা ভারতীর শিশু সংস্কার কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ

গত ২৮, ২৯ জুন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের কেডিয়া ভবনে সেবা ভারতীর উদ্যোগে শিশু সংস্কার কেন্দ্রের শিক্ষিকা দিদিভাইদের প্রশিক্ষণবর্গ হয়। ১৬টি কেন্দ্রের ১৪ জন এবং নতুনকেন্দ্র চালানোর আগ্রহী ১ জন সহ মোট ১৫ জন দিদিভাই প্রশিক্ষণবর্গে অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রগুলিতে সংস্কার ও শিক্ষার মান আরো কীভাবে উন্নত করা যায় এবং শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি আরো আকর্ষণীয় কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা সেবা ভারতী ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি ক্ষিতীশ চন্দ্র খাঁড়া। বর্গে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা ভারতীর প্রদেশের সহ-সম্পাদক শিবদাস বিশ্বাস ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত সহ-সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ। বর্গ পরিচালনা করেন মুনমুন ঘোষ।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'মহাজনী গান'-এর আসর

গত ২১ জুন বিশ্বসংগীত দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবেদন 'মহাজনী গান'-এর আসরে গীত হলো বিখ্যাত পদকর্তাদের রচিত বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকগান। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উদয়শঙ্কর কক্ষে এই গানের আসরটি বসেছিল লালন আকাদেমির সহযোগিতায়।

আমাদের দেশে মহাজনী গানের প্রায় ৩০০ বছরের একটি মূল্যবান ধারা প্রচলিত আছে। দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকগানের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, চর্চা ও প্রকাশনার কাজ হওয়া সত্ত্বেও মহাজনী গানের ধারার পদকর্তাদের অনেকেরই সৃষ্ট গান চর্চার বাইরে চলে যাচ্ছে। এই অচর্চিত পদকর্তাদের গান নিয়েই 'মহাজনী গান' অনুষ্ঠানটি পরিকল্পিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমির চেয়ারম্যান অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক রঞ্জন প্রসাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মালবশ্রী দাস, সদস্য সচিব, রাজ্য সংগীত আকাদেমি।

উদ্বোধন পর্ব নিয়ে মোট ৩ ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট লোকসংগীত গবেষক শুভেন্দু মাইতি, তাপসী রায়চৌধুরী, অর্জুন ক্ষ্যাপা ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়; যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন অনন্ত শীল (তবলা ও ঢোল), বিশ্বজিৎ সরকার (বাঁশি), দীপঙ্কর বিশ্বাস (দোতারা), প্রবীর রায় (হারমোনিয়াম) এবং দীপঙ্কর ঘোষাল (পারকাশন)। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শুভেন্দু মাইতি।

সমাবেশ সমাচার

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

গত ২৯ জুন ভারতীয় জনতা পার্টির ১২৮ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে ও বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহায়তায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে বেহালা ডঃ এ. কে. পাল রোডে একটি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন সম্পাদক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং বেহালা নগরের সঙ্ঘচালক অলোক চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরে ১৮৩ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় ও ১১১ জনের চশমা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

ড. শ্যামাপ্রসাদ বলিদান দিবস উৎযাপন

গত ২৩ জুন ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বলিদান দিবস উপলক্ষে একটি পদযাত্রা সিউড়ী নগর পরিক্রমা করে। বিজেপি-র জেলা কার্যালয় থেকে উক্ত পরিক্রমা শুরু হয়ে নগরের পশ্চিমপ্রান্তে শ্যামাপ্রসাদ মোড়ে চারটি পথের মিলনস্থলে শেষ হয়। ড. মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণায়ব মূর্তিতে মাল্যদান করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বক্ষেত্র সংগঠক সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, বিজেপি-র প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুকুমার দাস, সিউড়ী নগরের ড. শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির সম্পাদক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, 'শ্রদ্ধার' সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু ও বিজেপি-র মহিলা মোর্চার নেত্রী স্বাগতালক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে একটি রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় শতাধিক ব্যক্তি রক্তদান করতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সরকারি পরিকাঠামোর অভাবের জন্য ৭০ জন রক্তদান করেন।

প্রয়াত ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ ও রাকেশ কুমারের স্মরণসভা

গত ২৫ জুন বিকেলে কলকাতায় কেশবভবনে প্রয়াত ড. দীনেশচন্দ্র সিংহের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা হয়ে গেল। ড. সিংহের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাংলার প্রাক্তন সঙ্ঘচালক অমল কুমার বসু, সঙ্ঘের প্রাক্তন অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ।

পাশাপাশি সীমা জনকল্যাণ মঞ্চ-এর সংগঠন সম্পাদক ও প্রবীণ প্রচারক প্রয়াত রাকেশ কুমারের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হয়। গত ১২ জুন জয়সলমীর থেকে যোধপুর যাওয়ার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারান। তাঁর জীবনের স্মৃতিচারণ করেন মঞ্চের সংযোজক সুভাষ নন্দী। রাকেশজীর দেশভক্তি ও সাংগঠনিক কর্মকুশলতার কথা তিনি উল্লেখ করেন। সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল রাকেশজীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা বর্ণনা করে বলেন বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষের জন্য তাঁর কিছু করার আগ্রহ ছিল লক্ষ্য করার মতো। স্বস্তিকা সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য প্রয়াত সিংহের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে বলেন, তিনি শুধু স্বস্তিকার একজন লেখক ছিলেন না, একজন পরম আত্মীয়ও ছিলেন। সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত এই দুই দেশভক্তের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলকে তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে স্বদেশ সেবায় সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

পশুপতিনাথ ঘোষের স্মরণে

রাধাগোবিন্দ পোদ্দার॥ ১৯৬৫ সালে ২৩ মার্চ সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে কলকাতা থেকে জীবনে প্রথম হুগলী জেলার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে নগর-প্রচারক হিসাবে এলাম। শ্রীরামপুর নগরে দীর্ঘ ৬ মাস শাখা বন্ধ ছিল। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলাম। উত্তর এলো— শাখা কে চালাবে, মুখ্য শিক্ষক কে হবেন? তখন পশুপতিদা একটি রিষড়া জুট মিলে কাজ করতেন। শাখা চালানোর জন্য নাইট ডিউটি নিয়েছিলেন। রাত্রি জাগরণের ফলে শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। তাই শাখাও বন্ধ হয়ে যায়।

পশুপতিনাথ ঘোষ অবিবাহিত ছিলেন। অঘোষিত প্রচারকের মতো পুরো জেলায় ভ্রমণ করতেন। আমি, পশুপতিদা ও আরো অনেকে মিলে চেষ্টার ফলে জেলায় সঙ্ঘকাজ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জেলায় তখন ৫৪ শাখা এবং প্রত্যেক খণ্ড (১৯) শাখাযুক্ত। এই

শাখার বৃদ্ধির পিছনে আমার পরম বন্ধু ও নিরলস সঙ্ঘপ্রেমী ও আত্মত্যাগী পশুপতিদার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একসঙ্গে ৩য় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ করেছি। সব সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে তিনি সেবা বিভাগ চালাতেন। নাম ছিল ডাঃ পশুপতিদা— অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, নীরোপ্যাথি কিনা জানতেন!

আমার পরম বন্ধু পশুপতিদা আজ নেই। ওঁর অমর আত্মা ভারত মাতার চরণে সমর্পিত হয়ে গেছে। মহাপুণ্যবান। লেখাপড়ায় কম কিন্তু অন্তর দেশাত্মবোধে পরিপূর্ণ। হৃদয় বিশাল। স্মরণ সভায় থাকতে না পাড়ায় খুবই দুঃখিত।

সবশেষে একটি ঘটনা— আমি মালদায় বিভাগ প্রচারক হিসাবে যাচ্ছি। তখন বিভাগ প্রচারক ছিলেন স্বর্গীয় অনন্তলাল সোনী, তাঁর ইচ্ছা পুরো জেলার একটি সম্মিলিত পথ সঞ্চালন হোক। পশুপতিদা বললেন যে শ্রীরামপুর সিপিআই-এর শক্ত ঘাঁটি। কম্যুনিস্টরা যদি এই শক্তি দেখে হয় সঙ্ঘ সমাপ্ত করবে নয়তো সঙ্ঘের শাখা দ্বিগুণ হবে। কোনটা চান? আমি বললাম, বিভাগ প্রচারকের ইচ্ছাকে আমাদের সম্মান জানানো উচিত। প্রায় ৪০০ সংখ্যা হলো। পরবর্তীকালে জেলা প্রচারকের চেষ্টায় জেলায় ১০০ শাখা হলো। সঙ্ঘের কাজ ঈশ্বরের কাজ। পশুপতি ঘোষকে প্রণাম জানিয়ে স্মৃতিচারণ শেষ করলাম।

‘শ্রদ্ধা’র ৫০তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ রবিবার, বর্ধমান জেলার পানাগড় গ্রামস্থিত ৮৪ বৎসর বয়স্কা বাসন্তী গোস্বামীকে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান গোস্বামী পরিবারের ভদ্রাসনে অনুষ্ঠিত হয়। গোস্বামীদের কুলদেবতা ‘জোড়া শিবলিঙ্গকে অর্ঘ্যপ্রদান ও তিনবার ‘ওঁ’ ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সনৎ কুমার তেওয়ারী। মাকে প্রথমে পদধৌত, পূজন, মাল্যদান করা হয়। বস্ত্র, নামাবলি, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন অর্ঘ্য স্বরূপ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন বিশ্বানাথ চক্রবর্তী। গোস্বামী পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সনৎ কুমার তেওয়ারী। তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় অনুষ্ঠান সাফল্য লাভ করে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু গোস্বামী পরিবার, উপস্থিত সজ্জন মণ্ডলী ও মায়েদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

কাটোয়ার হরিনাম প্রচার সমিতির আলোচনা সভা

গত ২৮ জুন কাটোয়া রবীন্দ্র ভবনে হরিনাম প্রচার সমিতির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। প্রয়াত শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদান কাঠিয়াবাবার স্মরণে এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল— ‘জাতির জাগরণে হরিনামের ভূমিকা’। সমিতির সভাপতি ডাঃ অসীম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন, প্রধান অতিথি স্বস্তিকা সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, সমিতির সহ-সভাপতি দেবকুমার ভট্টাচার্য এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি রামমোহন গোস্বামী বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

‘প্রতিভা’র চিত্র প্রদর্শনী

পঁচিশজন উদীয়মান শিল্পীর ছবি নিয়ে প্রতিভা সন্ধানী প্রতিষ্ঠান ‘প্রতিভা’ সম্প্রতি ২৫তম গ্রীষ্মকালীন চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে বিড়লা আর্ট অ্যান্ড কালচার-এ। চিত্র প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ওয়াসিম কাপুর। প্রায় দেড়শত চিত্র এই প্রদর্শনীকে উদ্ভাসিত করেছে। অংশগ্রহণকারী শিল্পীগণের মধ্যে পনেরো জনই ছিলেন মহিলা। ছ’দিন ব্যাপী প্রদর্শনীটিকে মূলত তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সব ছবি খুঁটিয়ে বিচার না করেও বলা যায়, আধুনিকতার ছায়া বুকে নিয়ে পরম্পরায় উদ্ভাসিত। তবে কিছু শিল্পীর কাজে কিছুটা ধৈর্যের অভাব ঘটেছিল।

কৃষ্ণকলি ডুলিয়ার তুলিতে ছন্দ আছে। তাঁর অঙ্কিত চিত্রটি সরস্বতী? দর্শকের সম্ভবত মনে হয়েছে ‘মীরাবাঈ’। শিল্পী অমিতাভ সেনগুপ্তর ‘বৈকুণ্ঠেশ্বরী’ আগ্রহের সঙ্গে দর্শক দৃষ্টি দিয়ে লেহন করেছে। অনেক উৎসাহী দর্শক বৈকুণ্ঠেশ্বরীকে ক্যামেরাবন্দী করেছেন। প্রতিভার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণসন্ধ্যা

জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক মঞ্চের উদ্যোগে গত ২৮ জুন কলকাতার কেশবভবনে শ্যামাপ্রসাদ স্মরণসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল ‘ভারতের বর্তমান দৃশ্যপটে ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রাসঙ্গিকতা’। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য ও পাইওনীয়ার পত্রিকার সম্পাদক চন্দন মিত্র, ইগনু’র ইস্টার্ন জোনের এক্স-ডিরেক্টর ড. সুজিত ঘোষ, প্রাক্তন রাজ্য অভিলেখ্যাগার ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বক্তারা সকলেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা রূপে উল্লেখ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অজিত বিশ্বাস।

শোকসংবাদ

সহ-প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ প্রভাত মণ্ডলের পিতৃদেব সুশীল মণ্ডল গত ৩ জুলাই ভোরে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা মহকুমার আলমপুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, বাবার প্রেরণাতেই প্রভাত মণ্ডল প্রায় ৩০ বছর আগে প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আলমপুর সঙ্ঘস্থানে গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে দেশ-ধর্মের জন্য চতুর্থপুত্র তৎকালীন প্রান্ত প্রচারক কেশবজীর হাতে তাঁকে অর্পণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে আলমপুর গ্রাম একজন সত্যিকারের সঙ্ঘহিতৈষীকে হারালো।

***

গত ২৪ জুন আসানসোল জেলার ইছাপুর অঞ্চলের হেতডোবা গ্রামের সেবা বিভাগ পরিচালিত শিশু সংস্কার কেন্দ্রের ছাত্রী সোনিয়া কোঁড়া পথ দুর্ঘটনায় পরলোকগমন করে। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী সোনিয়া সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে মালবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়। সেবা বিভাগের কর্মকর্তারা শোকাহত পরিবারের পাশে থেকে সহযোগিতা করেন। গত ২৮ জুন গ্রামের সংস্কার কেন্দ্রে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্ধমান জেলা সঙ্ঘচালক বনমালী পালের পিতৃদেব নবকুমার পাল গত ২২ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। তিনি চার পুত্র, তিন কন্যা-সহ আত্মীয়-পরিজনদের রেখে গেছেন।

***

গত ১৬ জুন বীরভূম জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক গোপাল ভট্টাচার্য পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ১ পুত্র রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা ছিলেন।

***

গত ২৭ জুন হাওড়া জেলার খলিসানি খণ্ডের পুরনো কার্যকর্তা হিরন্ময় মণ্ডলের পিতা পরলোকগমন করেছেন।

***

গত ২৯ জনু হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া নগরের পুরনো স্বয়ংসেবক রবীন মান্নার মাতৃদেবী পরলোকগমন করেছেন। রবীন মান্নার চার ভাই-ই স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

***

গত ১ জুলাই মঙ্গলবার হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর খণ্ডের আমতা মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ শুভ্রপ্রকাশ দের ঠাকুমা ভ্রমরবালা দে ৯৫ বছরে পরলোকগমন করেছেন। তিনি ২ পুত্র, পুত্রবধূ, ৪ কন্যা, ১১ নাতি, ১৪ নাতনি, ১ নাতবৌ-সহ অনেক গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

উঠে আসছে ফুটবলের তৃতীয় বিশ্ব

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বকাপের লড়াইয়ে উরুগুয়ে এবং কোস্টারিকা।

ব্রাজিল বিশ্বকাপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কোস্টারিকা, চিলি, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, মেক্সিকোকে আর উপেক্ষা করা যাবে না। কোস্টারিকা দুই সুপার হেভিওয়েট টিম উরুগুয়ে ও ইতালিকে জমি ধরিয়ে দিয়েছে। মেক্সিকো যে বারবার ব্রাজিলের গাঁট তা আরো একবার প্রমাণিত। অস্ট্রেলিয়া নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে কী লড়াইটাই না দিল। এই সব ম্যাচ থেকে একটাই সার সত্য বেরিয়ে এসেছে বিশ্ব ফুটবলে, যারা এতদিন তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলে পরিগণিত হোত তাদের আর হাল্কাভাবে নেওয়া চলবে না বড় বড় রাষ্ট্রশক্তির। হয়ত এর পর কোনো বিশ্বকাপে এদের মধ্যে কেউ চ্যাম্পিয়নও হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে কোস্টারিকা এবং মেক্সিকো। মধ্য আমেরিকার দেশ হওয়ায় লাতিন আমেরিকার স্টাইল যেমন আছে তাদের খেলায় তেমনি পাওয়া যায় ইউরোপীয়ানদের গতি ও ক্ষিপ্রতা।

এবারের বিশ্বকাপে এদের সাফল্যের একটা বড় কারণ হলো ফুটবলারদের দায়বদ্ধতা ও স্বাজাত্যবোধ। বেশির ভাগ ফুটবলার দেশের ক্লাবে খেলে বলে একটা নির্দিষ্ট ছন্দ ও স্ট্রাটেজিতে খেলে অভ্যস্ত। ফলে দেশের হয়ে খেলার সময় বিশেষ সমস্যায় পড়তে হয় না। একসঙ্গে দীর্ঘদিন জাতীয় দলের ট্রেনিং সেখানে থাকার দরুন সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। কোচ ও সাপোর্ট স্টাফরা অনেকরকম পরিকল্পনা করে টিমকে মাঠে নামাতে পারেন। যে ব্যাপারটা সাধারণত দেখা যায় না বড় বড় দেশের ক্ষেত্রে। এই সব দেশের বেশিরভাগ ফুটবলার ইউরোপে নানান দেশে ক্লাব ফুটবল খেলে। একেক দেশের একেক রকম স্টাইল, টেকনিক। সারা বছর ওইভাবে খেলে আসার পর বিশ্বকাপে খেলতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন।

স্পেন-চিলি ম্যাচে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। বিশ্ব ও ইউরো চ্যাম্পিয়ন দলকে মাঠের সব জায়গায় টেক্কা দিয়ে দাঁড় করিয়ে হারাল চিলি। চিলির খেলায় এতরকমের ট্যাকটিক্স ও প্ল্যানিং আর সবসময় বিপক্ষের গোলমুখী যাবতীয় মুভমেন্টের যার কোনো উত্তর জানা ছিল না স্পেনের। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের প্রস্তুতির সময় পায় কতটুকু? ক্লাব খেলে আসা একদল চোটগ্রস্ত, ক্লান্ত ফুটবলার নিয়ে নিয়মমাফিক ট্রেনিং ক্যাম্প করে খেলতে নামে। আর অন্যদিকে চিলি, কোস্টারিকা, মেক্সিকোর ছেলেরা সারা বছর একসঙ্গে খেলে একটা নির্দিষ্ট বিন্যাস ও সমন্বয় গড়ে তোলে নিজেদের খেলায়। সব বিভাগের মধ্যে থাকে ভারসাম্য। দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে যথেষ্ট। যার সুফল ফলে বিশ্বকাপে। নক আউট পর্বে যেমন দেখা গেছে জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নাইজিরিয়া, চিলি, মেক্সিকোর মতো দলগুলি অতিরিক্ত সময়ের একেবারে শেষ লগ্নে গিয়ে হার স্বীকার করেছে। নেদারল্যান্ডের তারকা স্ট্রাইকার আর্জেন রবেন চমৎকার অভিনয় করে পেনাল্টি বক্সে পড়ে গিয়ে পেনাল্টি আদায় করে দলকে বৈতরণী পার করিয়ে দেন। মেক্সিকো এই বিশ্বকাপে অন্যতম ব্যালান্সড দল হিসেবে প্রতিপন্ন ছিল। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যারা বিশ্ব ফুটবলে অজ্ঞাতকুলশীল রাষ্ট্র তারা পর্যন্ত কিনা সেই বেলজিয়ামকে পর্যন্ত কাঁদিয়ে ছাড়ল। যথার্থ বলেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন জাতীয় গোলকিপার পিটার শিলটন। শিলটনের মতে এই বিশ্বকাপ সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছে সাম্প্রতিককালে। আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকার দেশগুলি সুপার পাওয়ার দেশগুলিকে যেভাবে বেগ দিয়েছে ও শেষপ্রান্ত লড়াই করে হার স্বীকার করেছে, তাতে ফুটবলের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। তবে এবার এশিয়া কিন্তু হতাশ করেছে। যদিও অস্ট্রেলিয়া এশিয়া ওশেনিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে ব্রাজিল গিয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রকৃত অর্থে এশিয় রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা। তবে একমাত্র অস্ট্রেলিয়াই নেদারল্যান্ডের সঙ্গে তুল্যমূল্য লড়াই দিতে পেরেছে। ইরানও খানিকটা লড়েছে আর্জেন্টিনার সঙ্গে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ন্যূনতম আস্থার প্রতিফলন দিতে পারেনি। দক্ষিণ কোরিয়া ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে (২০০২) সেমিফাইনালে উঠেছিল। সেটাই কোনো এশিয় রাষ্ট্রের সেরা পারফরমেন্স। যদিও কোরিয়া, জাপানের খেলোয়াড়রা ইউরোপের নানা দেশে পেশাদার ফুটবলে যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখিয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তী বিশ্বকাপে অবশ্যই কোনো এশিয় রাষ্ট্রের ধ্বজা তুলে ধরতে হবে, না হলে ফিফার কাছে গুরুত্ব হারাবে এশিয়া। ভবিষ্যতে এই মহাদেশে বিশ্বকাপ হওয়ার সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখলে নিজেদের খেলার মানকে তুলে ধরতে হবে এশিয় দেশগুলির। আর রাশিয়া বিশ্বকাপে কোস্টারিকা বা মেক্সিকোর মতো দেশ চ্যাম্পিয়ন হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

শব্দরূপ-৭১৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

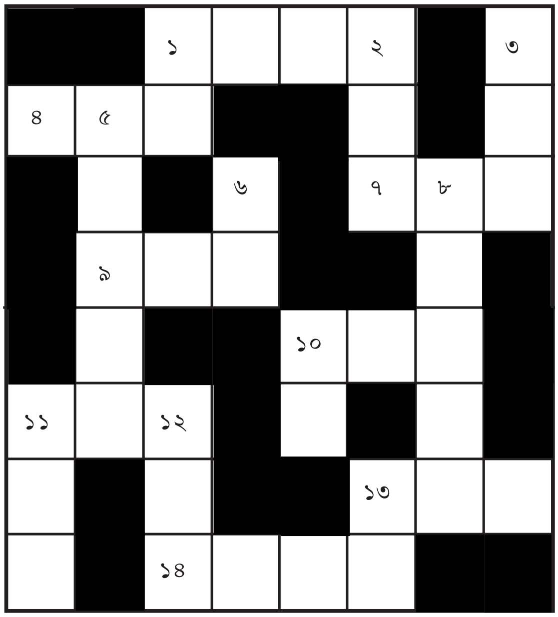

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. অল্প নরম শাঁসের ডাব, **৪.** 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া—' (প্রবচন), **৭.** মজা, কৌতুক, **৯.** এর রোগ মানে কেস জন্ডিস, **১০.** প্রয়াত বাঙালি সঙ্গীতশিল্পী, **১১.** বলরাম (আদরে), **১৩.** মৃত, **১৪.** রাজার রাজা; কুবের।

উপর-নীচ : ১. এ একবারই বেলতলায় যায়, **২.** একটি ছোট্ট পাখি, **৩.** পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন, কশ্যপ-বিনতার পুত্র, **৫.** 'সর্বঘটে—' (প্রবচন), **৬.** অশ্রু (পদ্যে), **৮.** সঙ্ঘভূত দেবগণ, যথা দ্বাদশ আদিত্য, দশম বিশ্ব, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ইত্যাদি, **১০.** 'ও আমার দেশের—, 'তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা', **১১.** মাতামহী বা পিতামহীর মাতা, **১২.** ইতিহাস-বিখ্যাত গুহামন্দির, **১৩.** 'অশ্বত্থামা রণে হত, ইতি—'।

সমাধান
শব্দরূপ-৭১১
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
শিবম মাহাতো
রানিবাঁধ, বাঁকুড়া

ঐ	ন্দ্রি	লা		চু	রু	লি	য়া
ক্য		দা	ড়ি	স্ব			
	ক	বি		ক	ল্প	ত	রু
	ল					ক্ষ	
	বি					শি	
ট	ঙ্ক	শা	ল		ক	লা	
			হ	ড়	পি		ক
দে	ব	সে	না		ল	ক্ষ্ম	ণা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭১৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৮ জুলাই, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

Design's For Modern Living

NEYCER

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com www.pioneerpaper.co

কোটিপতি হোন!

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন

১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ : দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090
9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সম্পর্কিত সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

বক্তব্য রাখছেন শাহনওয়াজ হোসেন। মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) ড. পবিত্র গুপ্ত, রাহুল সিনহা ও মে: জে: কে কে গাঙ্গুলী। ছবি : শুভঙ্কর মুখার্জী

দেশজুড়ে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের ১১৪তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৬ জুলাই সারা দেশজুড়ে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদের ১১৪তম জন্মদিন পালিত হলো। সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে তাঁর ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্পিকার সুমিত্রা মহাজন, লালকৃষ্ণ আদবানী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং, অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অরুণ জেটলি, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ-সহ সাংসদরা।

এদিন বিকেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে একটি আলোচনা সভা হয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতি এই সভার উদ্যোক্তা। এই অনুষ্ঠানে বিজেপি-র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও নেতা শাহনওয়াজ হোসেন, রাহুল সিনহা, সমিতির সভাপতি ড. পবিত্র গুপ্ত, সমিতির সংগঠন সম্পাদক মিহির সাহা, সহ-সভাপতি অমিতাভ ঘোষ ও ড. দেবব্রত চৌধুরী, অধ্যাপক তথাগত রায়, মে: জে. কে. কে. গাঙ্গুলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে শাহনওয়াজ বলেন, এই আইনের বলে কাশ্মীরের ভূখণ্ডে কাশ্মীরি ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় জমি কিনতে পারেন না। তাঁর আরও বক্তব্য, লালকেল্লায় যখন আমরা পৌঁছতে পেরেছি, তখন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চলে আসা খুব কঠিন নয়। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রী সিনহা এদিন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের পক্ষে ড. মুখোপাধ্যায়কে কার্যত অপমান করা হলো। উল্লেখ্য, এদিন বিধানসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মালা দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী বা শাসক দলের তরফে কোনো মন্ত্রী, বিধায়ক তো দূরের কথা, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন না। অধ্যাপক তথাগত রায় বলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে এযাবৎ একটি কমিশনও বসানো হয়নি। বরং একপয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনকে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু রহস্য থেকে চোখ ঘুরিয়ে দেওয়ার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আজ যে ভ্যালু সিস্টেম দেখছি তা পরিবর্তন করতে পারলেই বস্তুত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। মে: জে: কে. কে. গাঙ্গুলি বলেন, আজ যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে পারছি তা শ্যামাপ্রসাদেরই অবদান। এদিন হাওড়ার শিবপুরে মন্দিরতলায় ড. শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির নীচে এক অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদের রহস্যময় মৃত্যুর কারণ সন্ধানের জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করার দাবি জানানো হয়। কোচবিহারের দিনহাটায়, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে বস্ত্র ও রক্তদানের মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিবস পালন করা হয়। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
14 July - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা